আনন্দমেলা

১১ অক্টোবর ১৯৮১

২/-

নির্মল শ্বাস-প্রশ্বাস...
সুস্থ সবল দাঁত

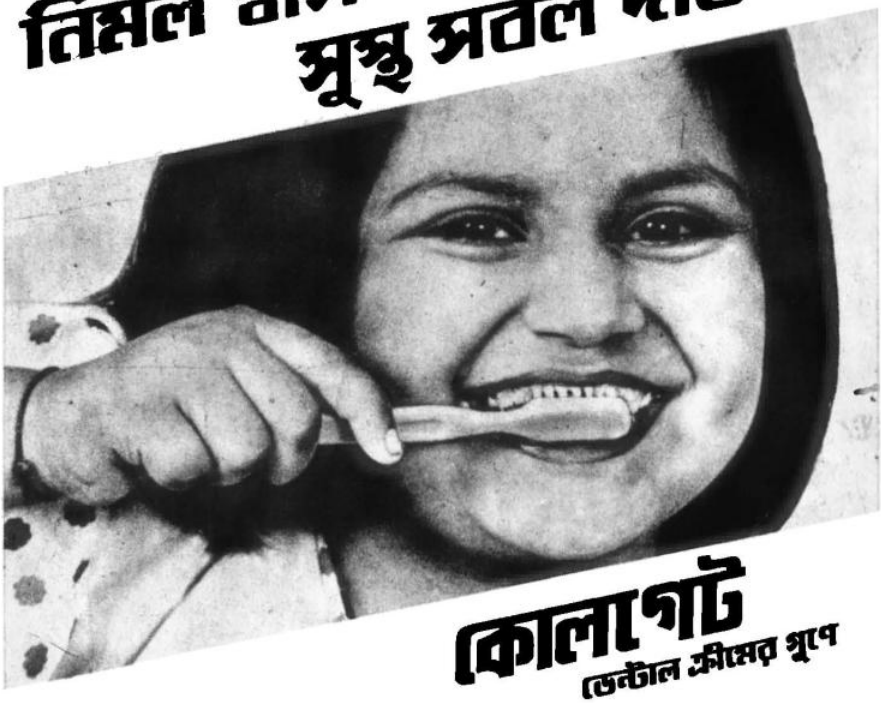

কোলগেট
ডেন্টাল ক্রীমের গুণে

প্রতিবার খাওয়ার পরেই কোলগেট দিয়ে দাঁত মাজুন। আপনার দাঁতকে সুরক্ষিত রাখার জন্যে সারা পৃথিবীতে দাঁতের ডাক্তাররা এই উপদেশই দেন।

দাঁতের ফাঁকে খাবারের টুকরো থেকে গেলে রোগ-জীবাণুর সৃষ্টি হয়। ফলে নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ আসে, পরে দাঁতে যন্ত্রণাদায়ক ক্ষয়রোগের শুরু হয়ে যায়।

সুতরাং প্রতিবার খাওয়ার পরেই কোলগেট দিয়ে দাঁত মাজুন। দাঁতকে সাদা ঝকঝকে করে তুলে নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ ও দাঁতের ক্ষয় রোধে কোলগেটের অসাধারণ ক্ষমতা বহুবার প্রমাণিত হয়ে গেছে।

কোলগেটে এমন এক চমৎকার তাজা মিষ্টি স্বাদ রয়েছে যে অনেকক্ষণ ধরে দাঁত ব্রাশ করতে ইচ্ছা করবেই।

কোলগেটের নির্ভরযোগ্য কার্যকলা কি ভাবে কাজ করে!

নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ ও দাঁতের ক্ষয়রোগের জীবাণু জন্ম নেয় দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা খাবারের টুকরো থেকে।

কোলগেটের প্রচুর ফেনা দাঁতের ফাঁকে ঢুকে অবাঞ্ছিত খাবারের টুকরো ও রোগ জীবাণু দুইই দূর করে।

ফলাফলঃ সাদা ঝকঝকে দাঁত, নির্মল তাজা শ্বাস-প্রশ্বাস ও দন্তক্ষয় রোগ প্রতিরোধের দৃঢ় মনোবল।

কোলগেট ডেন্টাল ক্রীম দিয়ে নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ দূর করুন... দাঁতের ক্ষয় রোধ করুন!

DC.G.74 BN

আনন্দমেলা

৪ কার্তিক ১৩৮৮ • ২১ অক্টোবর ১৯৮১ • ৭ বর্ষ • ১৪ সংখ্যা

বিশেষ রচনা

আফ্রিকার জঙ্গলে । দীপালি চৌধুরী ৪
ইলিশ শিকার । বিশ্বরঞ্জন সরকার ৩৬

গল্প

মরুভূমির জাহাজডুবি । অশেষ চট্টোপাধ্যায় ১০
সোনাদাদুর রহস্য । কণা বসুমিশ্র ২৫

স্মৃতিকথা

বসু-বাড়ি । শিশিরকুমার বসু ১৭

উপন্যাস

হারানো কাকাতুয়া । শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ২১
সিসের আঙটি । বিমল কর ৫৩

ছড়া

কড়া প্রশ্ন । রত্নেশ্বর হাজরা ৯
উপকারের প্রতিদান । পবিত্র সরকার ২৮
পুপুর ফানুস । শিবময় দাশগুপ্ত ৫১

খেলোয়াড়ের আত্মকথা

উইং থেকে গোল । পি. কে. ৪৮

চিত্রকাহিনী ও কমিক্স

রোভার্সের রয় ৩০, টিনটিন ৩২, টারজান ৬০
গাবলু ৬১, ৬৪, বাঘা ৬৫

লেখাপড়া

বিধাননগর রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়ের প্রধান-শিক্ষক
কী বলেন । রঞ্জিতকুমার ঘোষ ৫৭
বাংলা বলো । বাচস্পতি ৬২
সহজে ইংরেজি । প্রসাদ ৬৩

খেলাধুলো

পেনালটি রোখার রাজা । অশোক রায় ৪৩
নতুন অধিনায়ক । মণীশ মৌলিক ৪৫
শিবাজি ব্যানার্জির পুরোপাতা রঙিন ফোটো ৪১

অন্যান্য আকর্ষণ

ছবির মজা ২৭, ধাঁধা-মজা-রহস্য ৩৪
তোমাদের পাতা ৩৯, আঁকো-লেখো ৬৬

প্রচ্ছদ : অনির্বাণ নাগ

সম্পাদক ঃ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বাপাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড পি ২৪৮ সি আই টি রোড কলকাতা ৭০০ ০১৪ থেকে মুদ্রিত। - দাম দু' টাকা

বিমান মাশুল ঃ ত্রিপুরা ৫ পয়সা। পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ১০ পয়সা
পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা।

এক্ষুনি লাগান বার্নল—
পুড়ে যাওয়া জখমের
আসল চিকিৎসা!

পোড়ার জখমের সঙ্গে অন্যান্য জখমের অনেক তফাৎ। পুড়ে যাওয়ার জ্বালা তীব্র যন্ত্রণাদায়ক। আর পোড়া থেকে ফোস্কাও পড়ে। এর জন্যে আপনার দরকার পোড়ার জখমের আসল চিকিৎসা—বার্নল অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রীম। বার্নল নিমেষে জ্বালা উপশম করে, স্নিগ্ধ করে আর ফোস্কাও পড়তে দেয় না। পোড়ার জখম শীঘ্র উপশম করার সব ক'টি উপাদানই বার্নলে রয়েছে।

সবসময়ে ঘরেতে রাখুন বার্নল।

বার্নল

পুড়ে যাওয়া জখমের আসল চিকিৎসা।

আফ্রিকার জঙ্গলে

দীপালি চৌধুরী

আলুগুলো ধুতে যাবে কে, সেই হল সমস্যা। সেদিন চারদিকে এমন অন্ধকার ছিল যে মনে হচ্ছিল, আমরা যেন গভীর সমুদ্রে একটা নৌকোয় বসে আছি। আমাদের সম্বল শুধু লণ্ঠনের আলো আর টর্চ। আমাদের এই ক্যাম্পে লোকজন বলতে বাচ্চাদুটিসহ আমরা পাঁচজন। অল্প দূরে আমাদেরই মতো ক্যাম্পে আছেন কয়েকজন অরণ্যরক্ষী।

ক্যাম্পের লাগোয়া একটা চালায় আমরা রাত্রের খাবারের আয়োজন করেছিলাম। এমন সময় সিংহ ডেকে উঠল। সে ডাক ভয়ংকর সুন্দর, উগাণ্ডা-জাইরের সীমান্তে ইশাশার মতো বন্য প্রান্তরে রাত্রিবাস করতে করতে সিংহের ডাক আমরা শুনছিলাম। কানে এসেছিল বারবার।

সিংহের ডাক পাঁচ মাইল দূর থেকেও শোনা যায়। সিংহ হয়তো অনেক দূরে, কিন্তু ডাক শুনে মনে হবে পাশেই। তবে, এই পরিবেশে জোর দিয়ে কিছুই বলা যায় না। এ-কথা বললেন, আমাদের এ-দেশীয় মেকানিক ও ড্রাইভার বন্ধু কালিদি।

প্রথম ভয়ের ঢেউ কেটে গেলে আলুর পাত্র হাতে নিয়ে বাচ্চুর বাবা বাইরের অজানা অন্ধকারে পা বাড়াল। একটু পরে আবার সিংহের ডাক। ডাক শুনেই ফিরে এল বাচ্চুর বাবা।

চালার সামনে কাঠকুটো দিয়ে আগুন জ্বালানো হয়েছিল। রান্না হল সেই আগুনেই। চটপট খাওয়ার পাট সেরে নিলাম আমরা। তারপর ভাল করে আগুন নেবানো হল। না হলে হয়তো মাঝরাতে বুনো জন্তুরা জ্বলন্ত কাঠ টেনে এনে ফেলবে ক্যাম্পের খুঁটির গায়ে। তা হলেই কেলেঙ্কারি, ক্যাম্পে আগুন ধরে যেতে পারে।

ইশাশা প্রান্তরে টোপির দল

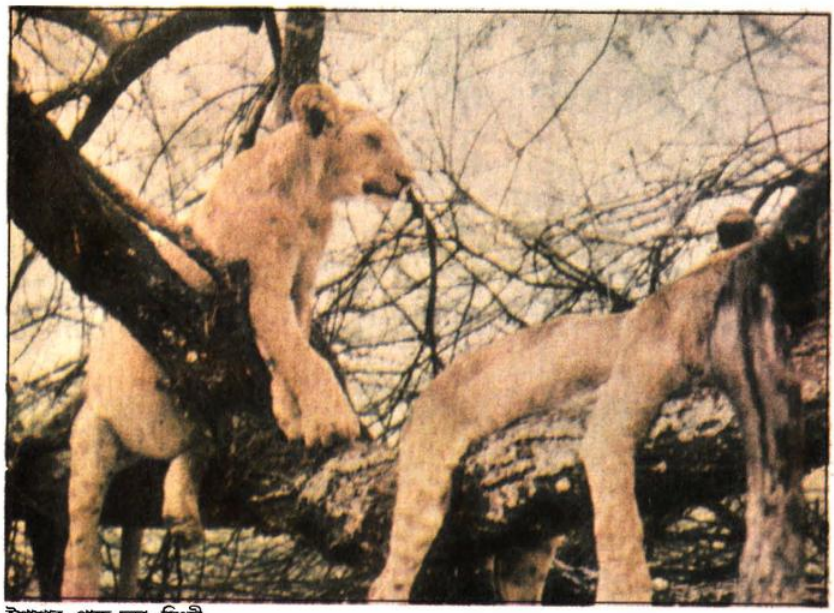

ইশাশার গাছে-চড়া সিংহী

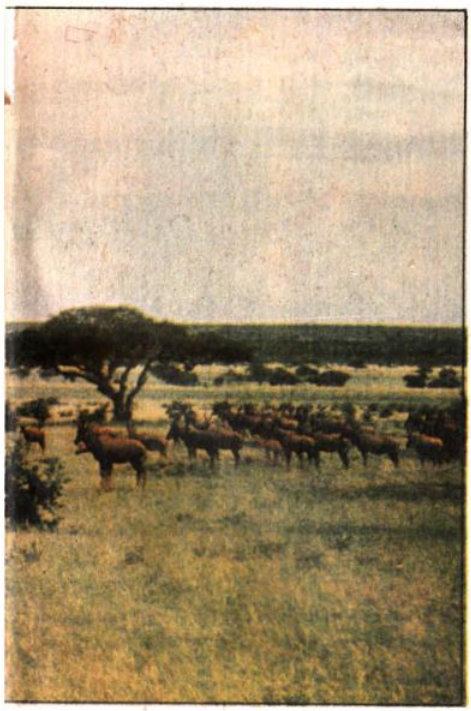

সিংহের গর্জন, বুনো মোষ আর রাত-পাখির বিচিত্র ডাক, ইশাশা নদীর জল থেকে খাদ্যের সন্ধানে উঠে আসা জলহস্তীদের সমবেত গাঁ-গাঁ ধ্বনি, আরও কত জানা-অজানা শব্দের ভেতর দিয়ে রাত কেটে গেল।

সকালে সম্পূর্ণ অন্য রূপ প্রকৃতির। সামনে বিস্তৃত তৃণভূমি, দূরে গাছপালা। পান্নার মতো সবুজ ঘাসে সোনালি 'উগাণ্ডা কব'-এর দল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে প্রাতরাশে ব্যস্ত। 'টোপি' আর 'উগাণ্ডা কব'—ইশাশার প্রধান বাসিন্দা এরাই। আমাদের দেশের হরিণের দেখা মিলবে না উগাণ্ডায়। এখানে সবই অ্যান্টিলোপ। হরিণের শিং প্রতি বছর গজায় আর ঋতুশেষে খসে পড়ে, কিন্তু অ্যান্টিলোপের শিং খসে না। আর হরিণের শিংয়ের মতো ডালপালাযুক্ত নয়।

টোপি আর কবের সংখ্যা বিরাট, সিংহরা তাই এখানে তোফা আরামে আছে। রোজ অবশ্য শিকার ধরে না। ধরে চার-পাঁচ দিন অন্তর। তারপর সদলে পেটপুরে খেয়ে শুয়ে-বসে ঝিমোয়। সচরাচর শিকার ধরে সিংহীরা। আমরা কিন্তু একটা সিংহকে শিকার ধরতে দেখেছিলাম এই ইশাশাতেই। সেদিন সিংহের সন্ধানে বেরিয়েছিলাম। হঠাৎ দেখা

ত্বক সুন্দর নির্মল, নববধূ পদ্ম উজ্জ্বল!

ক্লিয়ারাসিল ব্রণর মুখ খোলে, পরিষ্কার করে আর ছড়িয়ে পড়া রোধ করে।

ব্রণ বেরোলে অনেকেই তো অনেক রকম উপদেশ দিয়ে থাকেন। কিন্তু কাজের উপদেশের জন্যে শুনুন পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ কিশোর কিশোরীরা ক্লিয়ারাসিলের উপকারীতা সম্বন্ধে কি বলেন। ক্লিয়ারাসিল...নিরাপদ আর সুবিধেজনক ওষুধ—যার বিশেষত্বই হ'ল আপনার ব্রণর সমস্যার সমাধান করা। এখন ক্লিয়ারাসিলের সাহায্যে কতখানি ব্রণ পরিষ্কার আর রোধ করবেন তা আপনার ওপর নির্ভর করছে।

অদ্বিতীয় ৩-ভাবে ক্রিয়া

শুধু ক্লিয়ারাসিলই তিনভাবে কাজ করে।

১। ব্রণর মুখ খুলে দেয়—ক্লিয়ারাসিলের বিশেষ ফরমুলেশন ব্রণর মুখ খুলতে সাহায্য করে।

২। ব্রণ পরিষ্কার ক'রে দেয়—ব্রণর ময়লা বার ক'রে দিতে সাহায্য ক'রে, ফলে ক্ষতিকর-ভাবে টিপে বার করতে হয় না।

৩। ব্রণ শুকিয়ে দেয়—অতিরিক্ত তেলাভাব শুষে নিয়ে ব্রণ পরিষ্কার করতে সাহায্য করে।

কি ক'রে দেখুনঃ

- প্রতিদিন সকালে আর সন্ধ্যেয় ক্লিয়ারাসিল ব্যবহার করুন।
- ক্লিয়ারাসিল সারা মুখে লাগান। ব্রণর জায়গায় একটু বেশী পরিমাণে লাগান।
- ব্রণ পরিষ্কার হয়ে গেলেও ক্লিয়ারাসিল ব্যবহার করতে থাকুন কারণ ক্লিয়ারাসিল অতিরিক্ত তেলাভাব শুষে নিয়ে ব্রণ রোধ করে।

মুখখানিতে ফুটে উঠলে স্নিগ্ধ লাবণ্য, জীবনের প্রতিপল মনে হবে ধন্য!

বিশ্বের "১" নম্বর ব্রণর ক্রীম

OBM 2115 R BN

এক ক্ষুধার্ত সিংহের সঙ্গে। বেচারার বোধহয় সিংহী ছিল না, তাই খাদ্যের খোঁজে নিজেই বেরিয়েছিল। ঝোপের ধারে ছিল একটা বাচ্চা অ্যান্টিলোপ। চোখের নিমেষে সেটাকে ধরল সিংহটা।

আমরা সামনে থাকার জন্যে বোধহয় খেতে অসুবিধে হচ্ছিল পশুরাজের। সে শিকারটা মুখে করে হাঁটতে লাগল দ্রুত। আমরাও চললাম পিছু-পিছু। সে কিছুটা যায় আর শিকার মাটিতে রেখে আমাদের দিকে তাকায়। আবার মুখে তুলে হাঁটতে থাকে। আধ ঘণ্টা পরে বিরক্ত হয়ে সিংহমশাই শিকারসহ একটা ঝোপের আড়ালে চলে গেল।

সিংহের দোষ দিই না। নাছোড়বান্দার মতো পেছনে লেগে থাকলে রাগ হবারই কথা। তবু তো সে তেড়ে আসেনি। এই সফরেই দেখা হয়েছিল এক সিংহ-দম্পতির সঙ্গে। আমরা পেছন ছাড়ি না দেখে সিংহ দাঁত খিচিয়ে তেড়ে এসেছিল আমাদের দিকে। মানে-মানে কেটে পড়লাম আমরা।

ইশাশার মূল আকর্ষণ হল গাছে-চড়া সিংহ। পূর্ব-আফ্রিকায় গোটা-তিনেক জায়গা আছে যেখানে নাকি সব সিংহই গাছে চড়ে। স্থান বিশেষে কেন যে সিংহরা এই খাপছাড়া আচরণ করে তা নিয়ে নানা মুনির নানা মত। তবে দুপুরের গরমে গাছের ডালে শুয়ে থাকলে বোধহয় আরাম লাগে, হাওয়া-বাতাস লাগে, আবার পোকামাকড়ের উৎপাত থেকেও বাঁচা যায়। আগে জানতাম সিংহ তাড়া করলে গাছে চড়ে বাঁচা যায়, কিন্তু ইশাশায় এসে মত পালটাতে হল।

ইশাশা যে সভ্য জগৎ থেকে কত দূরে তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিলাম আমাদের গাড়ির ফ্যান-বেল্ট ছিঁড়ে যাওয়ার জন্যে। আমাদের স্পেয়ার ফ্যান-বেল্ট মাপে একটু ছোট ছিল। তবে কপাল ভাল, ক্যাম্পের কাছে এসে এই অঘটনটি ঘটেছিল। এখন কী করা যায়? ক্যাম্পে আমরা ছাড়া আর কোনও ট্যুরিস্ট নেই, কোন গাড়িও আসছে না। রুয়েঞ্জোরি ন্যাশনাল পার্কের হেডকোয়ার্টার্স ময়াতে রেডিও মারফত খবর পাঠানো হল। তবু কারও দেখা নেই। আমাদের অবস্থা কাহিল। এদিকে আবার প্রচণ্ড বৃষ্টি শুরু হয়েছিল।

সে রাত্রে শিম আর রাঙাআলু সেদ্ধ খেয়ে যখন আমরা বারান্দায় এসে বসলাম, তখন চারদিক মিশকালো। দূরে ঘাসে আগুন লেগেছিল চক্রাকারে। গাঢ় অন্ধকারে উজ্জ্বল কমলা রঙের একটি বৃত্ত। দারুণ লাগছিল দেখতে। চারদিকে নানা জীবজন্তুর আওয়াজ।

পরদিন সকালে একজন গেম ওয়ার্ডেন মিস্টার দিন্ এলেন। উনি আমাদের দুর্গতি দেখে দয়া করে ওঁর গাড়িতে চাপিয়ে অভয়ারণ্যে নিয়ে গেলেন আমাদের। অভয়ারণ্য লোকালয় থেকে বহু দূরে। মোট এলাকা কয়েক শো বর্গমাইল। এটি হল জীবজন্তুদের প্রাকৃতিক আবাসভূমি। এখানে বহুকাল ধরে নানা জীবজন্তু বাস করছে। চিড়িয়াখানার মতো তাদের এখানে কেউ ধরে রাখেনি। এদের মারা নিষেধ। দেশ-বিদেশ থেকে অসংখ্য ট্যুরিস্ট আসে এই পার্কে। অভয়ারণ্য প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করে।

মিস্টার দিন্ আমাদের গোটা-পাঁচেক বদমেজাজি বুড়ো সিংহের একটা দলের কাছে নিয়ে এলেন। বাচ্চুর বাবা যেই না ক্যামেরাটা তুলেছে, অমনি একটা সিংহের লেজ সটান উঠে গেল ওপরে। মিস্টার দিন্ সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি চালিয়ে বেরিয়ে গেলেন। আমাদের আর ছবি তোলা হল না। মিস্টার দিন্ বললেন, "উপায় ছিল না। চোখের পলক ফেলতে যতটুকু সময় লাগে তার মধ্যেই সিংহটা তোমাদের কাউকে টেনে নিয়ে যেত নির্ঘাত।"

আমাদের ক্যাম্পে নামিয়ে দিয়ে মিস্টার দিন বাচ্চুর বাবা আর কালিদিকে নিয়ে সব চেয়ে কাছের জনপদ কাটুঙ্গুরু গ্রামে চলে গেলেন। কাটুঙ্গুরুর পথে পড়ে বিশাল মারামাগোম্বো অরণ্য। একবার এই জঙ্গলে আমরা আটকা পড়ে গিয়েছিলাম। রাত কাটাতে হয়েছিল সেখানে। সেই রাতেই, একটু দূরে সিংহের হাতে মারা পড়েছিল এক অরণ্যরক্ষী। খুব জোর বেঁচে গিয়েছিলাম আমরা।

সন্ধেয় ফ্যান-বেল্ট কিনে ফিরে এসে বাচ্চুর বাবা শোনাল এক অপূর্ব কাহিনী। অভয়ারণ্য থেকে কাটুঙ্গুরু গ্রামে নাকি একটা হাতি প্রায়ই বেড়াতে আসে। গ্রামের লোকজন আর দোকানদারদের সঙ্গে তার খুব বন্ধুত্ব। গ্রামের বাজারে যত গাড়ি আসে সব তার একবার দেখা চাই। খোলা গাড়ি হলে তো কথাই নেই, শুঁড়

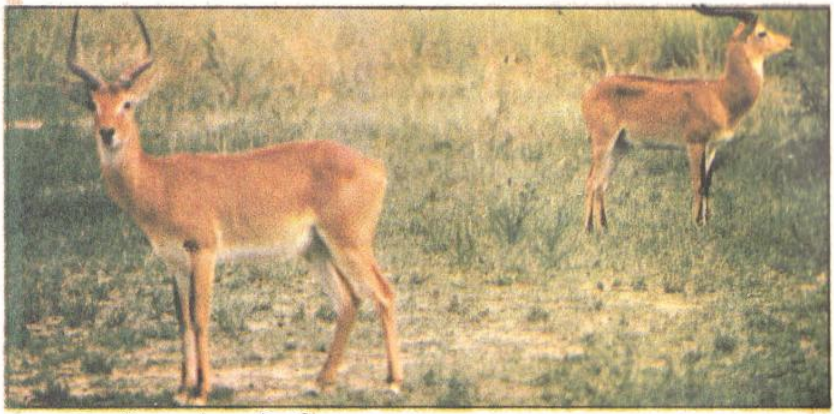

আমাদের দেখেই ঘুরে দাঁড়াল দুই হরিণ

বুলিয়ে কলাটা-মুলোটা পাওয়া যায় কি না।

বাসুর বাবা ফ্যান-বেল্ট কিনতে বাজারে নেমে দেখেন, হাতিটা একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে। এমন সময় একটা খোলা গাড়ি কিছু যাত্রী ও মালপত্র নিয়ে এসে দাঁড়াল। যাত্রীরা নামল। হাতি শুঁড় দিয়ে আরম্ভ করে দিল অনুসন্ধান। এক বুড়ির বাক্স তার খুব মনে ধরে গেল। শুঁড়ে করে বাক্সটা তুলে আনল হাতি। তাই দেখে বুড়ি মহা কান্নাকাটি জুড়ে দিল। শেষে হাতিকে কলা-টলা ঘুষ দিয়ে বাক্স উদ্ধার করা হল। এই হাতিটাকে পরে আমি দেখেছি। অরণ্যরক্ষীরা ওকে অভয়ারণ্যের নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার বহু চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। শেষ পর্যন্ত তাদের আশঙ্কাই সত্যি হল। চোরা-শিকারীর লোভে প্রাণ হারাল হাতিটা।

আফ্রিকার অভয়ারণ্যে চলতে চলতে যা প্রত্যক্ষ করেছি তা বড় দুঃখের। দেখেছি, জীবজগতের চমৎকার পরিবেশ দিনের পর দিন নষ্ট করে দিচ্ছে মানুষের লোভ। হাতির দাঁতের জন্যে মারা পড়ছে হাতি, গণ্ডার মরছে খড়্গের জন্যে।

সব দেশেই একদা প্রকৃতির স্বাভাবিক লীলাভূমি ছিল। এখন বোধহয় আফ্রিকা ছাড়া আর কোথাও নেই। ইশাশায় বেশ কয়েকবার এসেছি, কিন্তু এখানে এলেই আবার আসতে ইচ্ছে করে। আফ্রিকার অরণ্যের আকর্ষণ মনে হয় কারও পক্ষেই এড়ানো সম্ভব নয়।

গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করছে তরুণ সিংহ

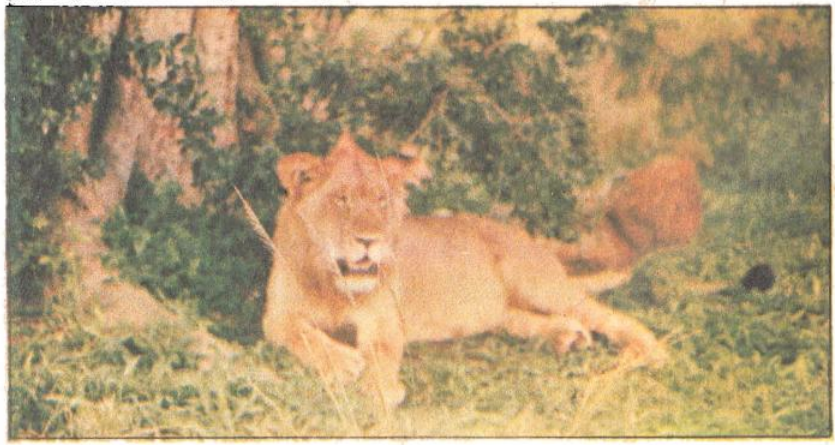

কড়া প্রশ্ন

রত্নেশ্বর হাজরা

মজার দেশের রাজার সাথে
শর্ত আছে কড়া
বিকেলবেলা ধরবে না সে পড়া—
সকালবেলা খেলতে দেবে—
দুপুরবেলা ছুটি
লাটাই দেবে লাটিম দেবে
ঘুঙুর-পরা ময়না দেবে
একটি সবুজ টিয়ার সাথে
হলুদ পক্ষী দুটি

বিরাট মাঠের মধ্যে দেবে
উপুড় করে খোলা
একটা আকাশ—নীচে মেলায়
ঘুরছে নাগরদোলা
যখন খুশি দুলতে দেবে
এপার থেকে ওপার
মাটির ঘোড়ায় পাখ্না দেবে
উড়িয়ে দেবার বাতাস দেবে
হাওয়ার ইচ্ছে-মতন পিঠে
বানিয়ে দেবে সওয়ার।

কোঁচড়-ভরা মানিক নিয়ে
বিলোয় যখন বুড়ি
ঘোড়ার খুরের ধুলোর মধ্যে
বাচ্চা মেঘের ঘুড়ি
উড়ছে দেখে ছুটির গল্প
লাফাচ্ছে কার ঝোলায়?
মজার দেশের রাজার কাছে
প্রশ্ন আছে কড়া
মাটির ঘোড়াও পাখ্না পেলে
হঠাৎ কেন পালায়?

ছবি অনুপ রায়

মরুভূমির জাহাজডুবি

অশেষ চট্টোপাধ্যায়

দোতলার বারান্দা থেকে দেখলাম পুপু ছুটতে ছুটতে আসছে স্কুল থেকে। এমনিতে হালকা পাতলা চেহারা। বয়েস দশ হলেও ওজন আট বছরের। দৌড়ঝাঁপের ঝক্কিতে বিশেষ যায় না। আজ কিন্তু পারলে একতলা থেকে দোতলায় উড়ে আসে।

"বাবা, সার্কাসের উটটা না মরে যাচ্ছে," মাঝসিঁড়ি থেকে এই জরুরি ঘোষণা। বাকি সিঁড়িগুলো ডিঙোতে পা তিন-চার ধাপ ছুঁল কি ছুঁল না। চশমাটা নাকের যেখানে থাকার কথা তার চেয়ে আধ ইঞ্চি নীচে। সারা মুখে ঘামের বার্নিশ।

আমার মুখের জিজ্ঞাসার চিহ্ন আমলই পেল না ওর কাছে। কিছু বলার আগেই আবার সিঁড়ি বেয়ে উলটো মুখে দৌড়। ওর মা সামনে থাকলে এ-রকম ছাড়া পাওয়া হরিণছানার মতো ছুটতে পারত না। এক-মেয়ে হবার আবদারটা সব সময় বাবার ওপর।

বাড়ির দুশো গজের মধ্যে খোলা মাঠে সার্কাসের আসর। ছাদ থেকে নজরে পড়ে ঢাউস তাঁবুর বড়-বড় ফোকরগুলো। সার্কাসের অবস্থা কাহিল গোছের। জন্তু-জানোয়ারগুলোর চেকনাই কম। সব সময় যেন হাফ-র‍্যাশানে। ঘোড়াগুলোর গায়ে মাংসের চেয়ে হাড় বেশি। বাঘের খাঁচাটা তাঁবুর মধ্যে আছে কোথাও। প্রায় ঘণ্টায় ঘণ্টায় ডাকে বাঘটা।

উটটাকেও পুপু দেখিয়েছে। চোখে বেশি পড়ে উটের সঙ্গের লোকটা। মাথায় পেল্লায় পাগড়ি। টকটকে লাল রঙ। উট আর রক্ষক দুজনেই বোধহয় রাজস্থানের বাসিন্দা। লোকটার জামাকাপড় সেই রকমই। পুপু আর আমি কিছুদিন আগে সোনার কেল্লা দেখেছি। পুপুর ধারণা, উট আর সঙ্গের লোকটা নিশ্চয়ই পার্ট করেছে সোনার কেল্লায়। রোজ সকালে লাল-পাগড়ি-পরা উটওয়ালা তার উট নিয়ে মর্নিং ওয়াক করতে বেরোয়। পুপু দেখতে থাকে।

স্কুল থেকে ফিরেই বিকেলবেলায় পুপু যেন কোথায় বেরিয়েছিল। একটু পরেই আবার বাড়িতে। এবার আর সিঁড়ি-কাঁপানো ধুপধাপ নেই। এক হাতে চশমা, আরেক হাতে চোখ রগড়াচ্ছে। তাতেই শোকসংবাদের নোটিশ। ঠোঁট কাঁপছে কান্না চাপার চেষ্টায়।

"উটটা না মরে গেল," বলেই এক ছুটে আমার কোমর জড়িয়ে ধরল। আর অমনি শুরু হল চোখের জলের বন্যা।

"কী হয়েছিল রে," মাথায় হাত বুলিয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

"সকালবেলা একটা ট্রাক ধাক্কা মেরেছিল," অত দুঃখ আর উত্তেজনার মধ্যেও খবরটা যোগাড় করতে ভোলেনি পুপু। হাঁফাতে-হাঁফাতে বলল, "সঙ্গের লাল-পাগড়ি-পরা লোকটা অনেক কষ্টে হাঁটিয়ে নিয়ে এসেছিল উটটাকে। লোকটার কথায় কোনো রকমে ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে সামনের মাঠটা পর্যন্ত এসেই শুয়ে পড়েছিল। দুপুর থেকেই হাত-পা ছড়িয়ে দিয়েছিল, আর নড়ছিল না,"

বলতে বলতে আবার নতুন করে কান্নার জোয়ার।

"আচ্ছা বাবা, আমাদের ভুটেকে যে হাসপাতালে নিয়ে যাও ইঞ্জেকশান দিতে, সেখানে কেন নিয়ে গেল না উটটাকে?" কান্নাটা মুলতুবি রেখে জিজ্ঞেস করল পুপু।

"এবার স্কুলের ইউনিফর্ম ছেড়ে হাত মুখ ধোও," ওর গোলমেলে প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে আমি বললাম, "তারপর মাকে বলো খেতে দিতে।"।

সার্কাসে বিকেলের শোয়ের বাজনা বাজছে। মাইক্রোফোনে বাইরে যারা দাঁড়িয়ে, তাদের টিকিট কাটার অনুরোধ। সব শব্দ ছাপিয়ে হঠাৎ বাঘের ডাক। ডেকেই চলেছে সমানে। কেমন ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে। সব বন্দী জন্তুগুলোর হয়ে প্রতিবাদ করছে একা বাঘটা।

আমার কাজ হল/এই জেলা-শহরটাকে খুঁটি করে ঘুরে-ঘুরে সার আর পোকামারার ওষুধ বিক্রি করা। ট্যুরে না থাকলে বিকেলের আড্ডাটা এক বড় ডিলারের দোকানে। মাঠের ধার দিয়ে রাস্তা। না দেখলাম উট, না দেখলাম লাল-পাগড়ি-পরা লোকটাকে। একটা মাঝারি ভিড় মাঝখানে পাঁচিল হয়ে দাঁড়িয়ে।

বাড়ি ফিরতে-ফিরতে রাত্তিরের ইংরিজি খবর শেষ। তখন মাঠ অনেকটা ফাঁকা। সার্কাসের অজুহাতে হঠাৎ-গজানো চায়ের দোকান। তার হ্যাজাকের আলোয় অন্ধকার খানিক ফিকে। চেনা গেল ছায়ায় ঢাকা লাল পাগড়ি। একদম নড়ছে না লোকটা।

বাড়ির কাছ-বরাবর বাতাসে চাপা টেনশান। রাস্তার মাথায় অমাবস্যা রঙের পুলিশের গাড়ি। খাকি পোশাকপরা দু-চারজন এদিক-ওদিকে। একটু তফাতে অন্য লোকজন। পুলিশ দেখলে যেমন হয়। রাস্তায় নানান সাইজের ইঁটের টুকরো। সামনে নিবারণ ঘোষের বাড়ি। জানলায় পোশাকি কাচের বদলে নানান ডিজাইনের খাঁজকাটা অন্ধকার।

বাড়িতে ঢুকতেই বাইরের থমথমে দৃশ্যের আগের ব্যাপারটা জানা গেল। কথক তিনজন। পুপু, তার মা আর প্রতিবেশী চৌধুরি সাহেব। শেষের জন আমার অপেক্ষায় অধৈর্য হয়ে প্রায় উঠি-উঠি। চৌধুরি সাহেব এক সাগরপারের বড় তেল-কোম্পানির এখানকার অফিসের সবচেয়ে উঁচু চেয়ারখানার মালিক। সারাদিন অফিসের সবচেয়ে উঁচু পেট্রল আর ডিজেলভর্তি ওয়াগনে তেল ভরা আর খালাস নিয়ে গোমড়ামুখ। সন্ধেবেলা সেই মানুষই আবার

ঝরঝরে
তরতাজা
হ'য়ে উঠুন
Liril
THE FRESHNESS SOAP
Liril
Liril
একেবারে আলাদা জাতের সাবান লিরিল। সবুজ তরঙ্গ—
লেবুর চনমনে সতেজতায় ভরা। ঝরঝরে চনমনে হ'তে লিরিল...
স্নানের পর আপনি হ'য়ে উঠবেন চনমনে এক অন্য মানুষ!
লিরিল
তরতাজা হবার সাবান
লেবুর মত চনমনে তরতাজা
লিনটাস-LR.28-203 BG
হিন্দুস্থান লিভারের এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন

হাসির রুমালে মুখ মোছেন।

উটের অপমৃত্যু। তারপরেই নিবারণ ঘোষের বাড়ির শার্শিতে নানান সাইজের ফাঁকফোকর। দুটো কিন্তু আলাদা আলাদা ঘটনা নয়। মাঝখানে হাইফেন পাড়ার ছেলেরা। চৌধুরি সাহেব মূল গায়েন। পুপু আর তার মা ধরিয়ে দিল দু-একটা ছেড়ে যাওয়া ছোটখাট পয়েন্ট।

নিবারণ ঘোষের গায়ের চামড়া মিশকালো। বুকে-পিঠে কাঁচাপাকা লোমের কম্বল। আধ ডজন লরির মালিক নিবারণ ঘোষ ছাতা মাথায় ঠায় দাঁড়িয়ে বাড়ি তুলেছেন। গ্রিল, মোজেইক, জাফরি, শার্শি আর রঙের বাহারে নজর কাড়ার মতো বাড়ি। এমন বাড়ির মালিককে শৌখিন লোক বলে মনে হতে পারে। কিন্তু স্কুলের নীচের ধাপ থেকে ঠিকরে বেরিয়ে যাবার পর কোথাও আর পালিশ লাগেনি। বাড়ির বাইরের কারুকে নিজের রোজগার-করা পয়সার ভাগীদার করতে নারাজ। অনাথ আশ্রম, বন্যা কিংবা সর্বজনীন পুজোর চাঁদার বই তাঁর কাছে ষাঁড়ের সামনে লাল কাপড়। এই সব চাঁদা যারা আদায় করে, তারা আদা হলে নিবারণ ঘোষ কাঁচকলা। একবার চাঁদা নিয়ে কথা কাটাকাটি থেকে মস্ত লোকসানের ফেরে পড়েছিলেন নিবারণ ঘোষ। রাতারাতি অমন কায়দার রংকরা বাড়ির সারা গায়ে ধ্যাবড়া-ধ্যাবড়া কাদা আর গোবর। সকালে সেই দৃশ্য দেখে নিবারণ ঘোষের মুখে গালাগালের তোড়। বাড়ির আগের চেহারা ফেরাতে এক কাঁড়ি টাকা খরচ।

যে ট্রাকটি আজ সকালে উটের যমদূত হয়ে দেখা দিয়েছিল, সেটির মালিক নিবারণ ঘোষ। নিহত উটটিকে বাদ দিলেও আহতদের তালিকায় আরও জনাতিনেক। সার্কাসের মালিক, আহতদের আত্মীয়স্বজন, পাড়ার মস্তানদের জোরালো সাপোর্ট নিয়ে সন্ধেবেলা হাজির নিবারণ ঘোষের কাছে। দাবি ক্ষতিপূরণ। নিবারণ ঘোষের যেমন স্বভাব, তেরিয়া হয়ে মেজাজ দেখাতে আচমকা ইঁট-পাটকেলের ব্যাপারটা। একেবারে শেষ দৃশ্যে পুলিশের আবির্ভাব। কিন্তু তার আগেই ভাঙচুরের পালা খতম।

"আসলে ব্যাপারটা কী জানেন," চৌধুরি সাহেব বললেন, "অত বড় উটটা সামনে এসে পড়ায় ট্রাক-ড্রাইভার প্রথমটায় নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারেনি। ভাবল ভুল দেখছি। এটা তো আর রাজস্থানের ডেজার্ট নয়। ধাক্কাটা মেরে বুঝল ব্যাপার গুরুচরণ। কিন্তু ততক্ষণে সে একটা সাইকেল, একটা সাইকেল-রিকশা আর একটা জীপকে গোঁত্তা মেরে বসে আছে। তারপর রাস্তার লোকজন 'রে রে' করে তাড়া করাতে সাসপেন্স আর সহ্য করতে না পেরে একটা ল্যাম্পপোস্টকে উপড়ে থামল ট্রাকটা শেষ পর্যন্ত।"

পরের দৃশ্যগুলো যেমন ঘটে তেমনি। জনগণের হাতে ট্রাক-ড্রাইভারের গণ-ধোলাই, পুলিশ, অ্যামবুলেন্স, হাসপাতাল। শেষ পর্যন্ত একই হাসপাতালে এমার্জেন্সি ওয়ার্ডে পাশাপাশি খাটে শুয়ে ট্রাকে ধাক্কা-খাওয়া তিনজন আর সেই ট্রাকের ড্রাইভার। কলকাতা হলে ফায়ার ব্রিগেডেরও ডাক পড়ত। তবে এটা কিনা অনেক দূরের মফস্বল শহর। তাই গাড়িতে আগুন দেবার টেকনিকটা এখানকার লোকজন এখনও ঠিক রপ্ত করে উঠতে পারেনি।

গাছে ধাক্কা খাওয়ার পর ট্রাকের সামনের দিকের সঙ্গে নিবারণ ঘোষের নাকের খুব মিল। কিন্তু লোকটার হার্টটা লোহার মতো মজবুত। নইলে একসঙ্গে এতগুলো লোকসানের কপাল। একটা দু নয়া পয়সা হাত থেকে পড়ে গেলে সেটা খোঁজার জন্যে দরকার হলে রাস্তায় হামা দেন নিবারণ ঘোষ। এখন তেমনই খরচের খপ্পরে।

চৌধুরি সাহেব জানালেন ইট-পাটকেলের পালার পর পুলিশের মধ্যস্থতায় একটা রফা হয়েছে। সার্কাসের মালিককে হাজার টাকা এক রকম কবুলই করেছে নিবারণ ঘোষ। অন্য আহতদের আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে আলাদা বোঝাপড়া। তারপরেও খরচের ধাক্কা কম নয়। থানা, পুলিশ, কোর্ট সামাল দিয়ে আটক ট্রাক উদ্ধার, সেই ট্রাকের ভাঙা নাক সারানো, ততদিন সেই ট্রাক বসে থাকায় ব্যবসায় লোকসান, বাড়ির ভাঙা শার্শি বদলানো। তার ওপর গণধোলাইয়ে আহত ড্রাইভারের চিকিৎসার খরচও দিতে হতে পারে। খরচের ঘরে এই লাইনবন্দী আইটেম, চৌধুরি সাহেবই নিবারণ ঘোষের হয়ে লিস্টটা বানালেন—দেখলে যে-কোনো লোকেরই ব্লাড প্রেশার চড়ে যেতে বাধ্য। নিবারণ ঘোষের

এবার নিন! প্রাণচঞ্চল জীবনের জন্য অফুরান শক্তির রসদ

বুস্ট

মল্ট চকোলেট মিল্ক ড্রিঙ্ক

একটি ট্রেনের ইঞ্জিনের যেমন, আপনারও তাই—দিনটাকে ঠিকমতো শুরু করতে দরকার অফুরন্ত শক্তি। তাই রোজ সকালে আপনার চাই বুস্ট।

এই শক্তির রসদ আপনাকে সারাদিন তরতাজা, আর চূড়ান্ত গতিমান করে রাখে, বিশেষ করে ছেলেমেয়েদের, দৌড়ঝাঁপে যাদের শক্তি ক্ষয় হয় সবচেয়ে বেশী।

ওদের বুস্ট খেতে দিন। বুস্ট, মল্ট, কোকো আর দুধ থেকে তৈরী। পুষ্টির ব্যাপারে যারা সবথেকে ভাল বোঝেন সেই বিখ্যাত হরলিক্স নির্মাতাদেরই তৈরী-বুস্ট!

ঘন সুস্বাদু বুস্ট বেশী শক্তি যোগাতে অতুলনীয়, কারণ তা তৈরী হয় পুষ্টিকর ক্রীমযুক্ত দুধ, গম, মল্ট বার্লি আর কোকো থেকে।

আপনার ছেলেমেয়েকে সুস্থ-সবল করে গড়ে তুলতে বুস্টে রয়েছে অধিক সংখ্যক পুষ্টিকর উপাদান।

আর তা'ছাড়া বুস্টের স্বাদ! সারা পরিবারের জিভে-জল-আসা ঘন মল্ট চকোলেটের মজা! বুস্ট।

দিন শুরু করার শ্রেষ্ঠ উপায়। প্রতিদিন।

Boost 'হরলিক্স' নির্মাতাদের তৈরী

৫০০ গ্রাম-এর সাশ্রয়কারী রিফিল প্যাকেও পাওয়া যায়। এইটি কিনে ১ টাকা বাঁচান।

HTD-HMM-6820

চেহারা আর স্বভাব দুটোই বেশ ভিলেন-ভিলেন। তাঁর এই পাঁকে পড়ায় পুপু, তার মা, চৌধুরি সাহেব, কেউই অখুশি নয়।

চৌধুরি সাহেব চলে যেতে পুপু বলল, "সেদিন কীভাবে কাকটাকে মারল ঘোষজেঠু। বলো বাবা, পাপ হয়নি তাতে?"

পাপপুণ্যের মানে, অনেক কিছুর মতো, আমার ধারণার বাইরে। তবে পুপুর অভিযোগটা সত্যি। খুব এক পশলা বৃষ্টির পর একটা মাঝারি কাকের বাচ্চা কেমন করে জানি পড়ে গিয়েছিল নিবারণ ঘোষের বাগানে। ওড়ার ক্ষমতা ছিল না। একটা লম্বা লাঠি দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে কাকের বাচ্চাটাকে ঠুকে ঠুকে মেরেছিলেন নিবারণ ঘোষ। মাথার ওপর কয়েক স্কোয়াড্রন কাকের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে। তারপর লাঠির মাথায় করে রাস্তায় ফেলে দিলেন মরা কাকটা। পুপু আর আমি দুজনেই এই 'ঠাণ্ডা মাথায় হত্যাকাণ্ডের' সাক্ষী।

খাওয়াদাওয়ার পর একা বারান্দায়। রাত বেড়ে চারিদিক স্তব্ধ। নিবারণ ঘোষের বাড়ি অন্ধকার। সার্কাসের খেলা কখন শেষ। উটের খেলা ছাড়াই। চায়ের দোকানেও বাতি নেই। সারা মাঠে পুরোপুরি ব্ল্যাক-আউট। এর মধ্যে কোথাও রয়েছে উটটা। তার পাশে লাল-পাগড়ি-মাথায় উটওয়ালা। বাঘটা আবার ডাকছে। যেমন ডাকে থেকে-থেকে। খাঁচার মধ্যে আটকেপড়া জঙ্গলের গোঙানি।

পরের দিন সকালে পুপুকে নিয়ে ওর স্কুলের রাস্তায় এগোতে গিয়ে দেখি, মাঠে শোকযাত্রার তোড়জোড় চলছে। দড়ি দিয়ে বেঁধে, বাঁশ দিয়ে ঠেলে মরা উটটাকে ট্রাকে তোলার চেষ্টায় জন বারো-চোদ্দ লোক। ভনভন করছে মাছি। দুর্গন্ধ। বেঁচে থাকতেই উটটা নিশ্চয়ই বেশ ভারী। মরে তো লোহার চেয়ে বেশি ওজন। হিমশিম খাচ্ছে লোকগুলো। আশ্চর্য। লাল-পাগড়ি-মাথায় লোকটা তেমনি বসে। ওর চোখ দুটো খোলা। কিন্তু কিছুই যেন দেখছে না।

ছোটবেলায় দেখেছিলাম রাঙা পিসিমাকে। কতই বা বয়েস হবে, বছর পঁয়ত্রিশ। কোলের ছেলেটা সবে হাঁটতে শিখেছে। পিসেমশাইকে শ্মশানে নিয়ে যাবার পর দেওয়ালে হেলান দিয়ে পাথর। তেমনিভাবে একটানা দুদিন। সকলের অনুরোধ, কোলের ছেলেটার অবুঝ কান্না, কোনো কিছুই কানে যায়নি। লোকটার ভেতরটাও হয়তো অমনি ফাঁকা। মনটা বাইরে বেরিয়ে এসে উটের দড়ি ধরে হাঁটছে। যেমন হেঁটেছে বছরের পর বছর। শরীরটার কাজ নেই। তাই একভাবে বসে।

পুপু আর সামনের দিকে ঘাড় ঘোরাতেই পারছে না। চোখের আড়াল পড়লে হাঁটতে হাঁটতে বলল, "বাবা, উটটাকে কি পোড়াবে?"

"না, শহরের বাইরে কোথাও পুঁতে দেবে মাটিতে।"

"বাবা, উটকে মরুভূমির জাহাজ বলে, না?"

পুপু ভুলতে পারছে না অত বড় জন্তুটার হঠাৎ মরে যাওয়া। সায় দিলাম।

"গাড়ি চাপা না পড়লে উটটা আরও অনেকদিন বাঁচত, না বাবা।"

"হতে পারে, উট বোধ হয় মানুষের চেয়ে বেশি দিন বাঁচে," উটের পরমায়ু কত কাল ঠিক জানা ছিল না, তবু বললাম।

পুপু স্কুলে না পৌঁছনো পর্যন্ত আমার আর ওর সব কথা জুড়ে রইল লম্বা-গলা, পিঠে-কুঁজ, চালচলনে নড়বড়ে সেই জন্তুটা।

দুপুরে ফেরার সময় মাঠ ফাঁকা। উট, উটওয়ালা, কেউ নেই। সার্কাসের কাছে অল্প মেয়াদের পানের দোকান। তার সামনে সেই লাল-পাগড়ি-মাথায় লোকটা। এগিয়ে গেলাম। পাগড়ির নীচে মরুভূমির সূর্যের আঁচে পোড়া মুখ। কাঁধে লাঠির ডগায় একটা পুঁটলির মধ্যে তাবৎ সম্পত্তি।

"নাও ভাইয়া, পয়সা দিতে হবে না," পানওয়ালা এক বাণ্ডিল বিড়ি এগিয়ে দিল। নিল লোকটা কোনো কথা না বলে।

আমার চোখে জিজ্ঞাসা দেখে পানওয়ালা বলল, "ও দেশে চলে যাচ্ছে। সার্কাসের মালিক ওকে ছাড়িয়ে দিয়েছে। উটটা মরে গেল, ওকে আর রাখবে না।"

লোকটা পুঁটলি কাঁধে রওনা দিল। আস্তে-আস্তে। বাঘটা ডেকে উঠল। সার্কাসের তরফ থেকে ফেয়ারওয়েল। লাল-পাগড়ি-মাথায় একটা দুঃখী লোক চলে যাচ্ছে। একা-একা। সামনে অনেক রাস্তা। বাঘটা ডেকেই চলেছে।

ছবি অনুপ রায়

"মা বলতো আমি গালে কি লাগিয়েছি ?"

"ঠিক বলেছ ! বোরোলীন ! তুমি বলো বোরোলীন লাগালে গায়ের চামড়া ভালো থাকে। তাইতো আমি মুখে, হাতে, পায়ে লাগিয়েছি। এবার আমাকে একটা হামু দাও।"

জি ডি ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড, আশা মহল কলকাতা ৭০০ ০৮৮

HTC-GDP-3760

বসু-বাড়ি

শিশিরকুমার বসু

॥ ৩৭ ॥

বাড়ি থেকে লুকিয়ে পালাতে হলে কোন্ পথ ও দরজা দিয়ে বেরোনো যাবে, স্বাভাবিকভাবে সেই চিন্তাই মাথায় আসে প্রথমে। কারণ বাড়ির লোকজনকে অন্ধকারে রাখাটাই সমস্যা। ছদ্মবেশ যত ভালই হোক, আত্মীয়-স্বজনদের ক্ষেত্রে তার বিশেষ কোনও মূল্য নেই। বাড়ির কারও যদি একবার সন্দেহের উদ্রেক হয়, তাহলেই মুশকিল। মনে সন্দেহ জাগলে অনেকেই সেটা চেপে রাখতে পারেন না। অন্যদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করে দেন। রাঙাকাকাবাবুই আমাকে বলেছিলেন যে, এ-অবস্থায় পড়লে হয় প্ল্যানটা পুরোপুরি বদলাতে হয়, নয় যাঁর মনে সন্দেহ জেগেছে তাঁকে ব্যাপারটা খানিকটা বলে দলে টেনে নিয়ে তাঁর মুখ বন্ধ করতে হয়। আর একটি উপায় হচ্ছে সন্দিহান ব্যক্তিটিকে কোনও অজুহাতে দূরে কোথাও পাঠিয়ে দেওয়া—যাতে আসল ঘটনাটি ঘটার সময় তিনি কাছাকাছি না থাকেন। এই ধরনের অনেক সূক্ষ্ম প্রশ্ন রাঙাকাকাবাবু আমার সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন এবং বাড়ির ব্যাপারে ও আত্মীয়-স্বজনদের সম্বন্ধে বিশেষ-বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হয়েছিল।

এলগিন রোডের বাড়িটা উত্তর থেকে দক্ষিণে লম্বা ব্যারাকের মতো। মাঝখানে সারি দিয়ে ঘর, দুপাশে লম্বা খোলা বারান্দা। কোনও ঘর বা ভেতরের দালান বা উঠোন দিয়ে না গিয়ে বাড়ির এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে চলে যাওয়া যায়। তিনটে সিঁড়ি। বাড়ির মাঝামাঝি একতলা থেকে চারতলার ছাদ পর্যন্ত উঠে গেছে পুরনো স্টাইলের ভাল কাঠের সিঁড়ি। দ্বিতীয়টি বাড়ির পেছনের দিকে দোতলা রান্নাবাড়ি থেকে নেমে গেছে। তৃতীয়টি এখন আর নেই। বাড়ির একেবারে দক্ষিণে একটি ছোট্ট চার-ঘরওয়ালা দোতলা বাড়ি ছিল। যদিও বাড়িটি একটি ব্রিজ দিয়ে রান্না-বাড়ির সঙ্গে লাগানো ছিল, সেটির একটা আলাদা সিঁড়িও ছিল। ছোট্ট বাড়িটির কাঠামো দুর্বল হয়ে পড়ায় পরে ওটি ভেঙে ফেলা হয়। যা হোক, কোনও ঘরের কাউকে ব্যস্ত না করে পুব বা পশ্চিমের লম্বা বারান্দা ধরে সোজা এগিয়ে গেলে তিনটে সিঁড়ির যে-কোনও একটায় পৌঁছনো বেশ সহজ ছিল। বাড়ি থেকে বেরোবার পথও তিনটি ছিল বলা যায়। একটা মেন গেট। বাড়ির সামনের দিকেই কোণ ঘেঁষে রাস্তার ওপরেই একটি ছোট দরজা ছিল—পশ্চিমের লম্বা বারান্দার শেষে। আর একটা পথ দরকার পড়লে করে নেওয়া যেত। বাড়ির পেছনের মাঠে সেজোকাকাবাবু সুরেশচন্দ্রের একটা কারখানা ছিল, তার ভেতর দিয়ে।

এত সুবিধে যখন আছে, পেছনের বারান্দা আছে, পাশের ছোট দরজা আছে, একটু ব্যবস্থা করলে যখন বাড়ির পেছন দিয়েও বেরোনো যায়, গেটের কথা কি কেউ ভাবে? আমিও ভাবিনি। আমি চিন্তা করতে লাগলাম, রাঙাকাকাবাবুকে বোধহয় পশ্চিমের মানে পেছনের বারান্দা দিয়ে সোজা দক্ষিণে চলে যেতে হবে, তারপর রান্না-বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে নেমে একতলার পেছনের বারান্দা দিয়ে উত্তর দিকে ফিরে এসে ছোট দরজা দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়তে হবে। অথবা যদি বাড়ির পেছন দিক দিয়ে বেরোনো স্থির হয়, তাহলে পেছনের ছোট বাড়ির সিঁড়ি ব্যবহার করে মাঠের দিকে যেতে হবে। রাস্তায় হাঁটার জন্য তো ছদ্মবেশ থাকবে। আমি গাড়ি নিয়ে এলগিন রোডেই খানিকটা এগিয়ে পোস্ট অফিসের কাছাকাছি ওঁর জন্য অপেক্ষা করব। কিংবা বাড়ির দক্ষিণদিক দিয়ে এলগিন লেনে এসে তিনি গাড়িতে উঠবেন। এই ধরনের প্ল্যান মাথায় করে আমি রাঙাকাকাবাবুর কাছে হাজির

এলগিন রোডের বাড়ি, ভিতর থেকে তোলা ছবি

হলাম। দেখা যাক তিনি কী বলেন।

"কী, ভেবে দেখেছ? কিছু প্ল্যান মাথায় এল?"

আমি যা বললাম, ধৈর্যের সঙ্গে তিনি শুনলেন। আমি যখন থামি, তিনি তাঁর খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বাঁ হাতের তর্জনী ঠোঁটে ঠেকিয়ে কখনও আমার দিকে চেয়ে কখনও দেওয়ালে দৃষ্টি রেখে ভাবতে থাকেন। তারপর বললেন, "ভাবো, আরও ভাবো। একটু তাড়া আছে। বড়দিনের কাছাকাছি যে-কোনও দিন বেরিয়ে পড়তে হতে পারে।"

তিনি অন্য দিক থেকে একটা সঙ্কেত আশা করছেন। সেটা পেলেই যাত্রা শুরু করতে হবে।

রোজ-রোজ দরজা বন্ধ করে রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে কথা বলা স্বাভাবিকভাবেই কারও কারও মনে সন্দেহ বা কৌতূহলের উদ্রেক করল। ইলা

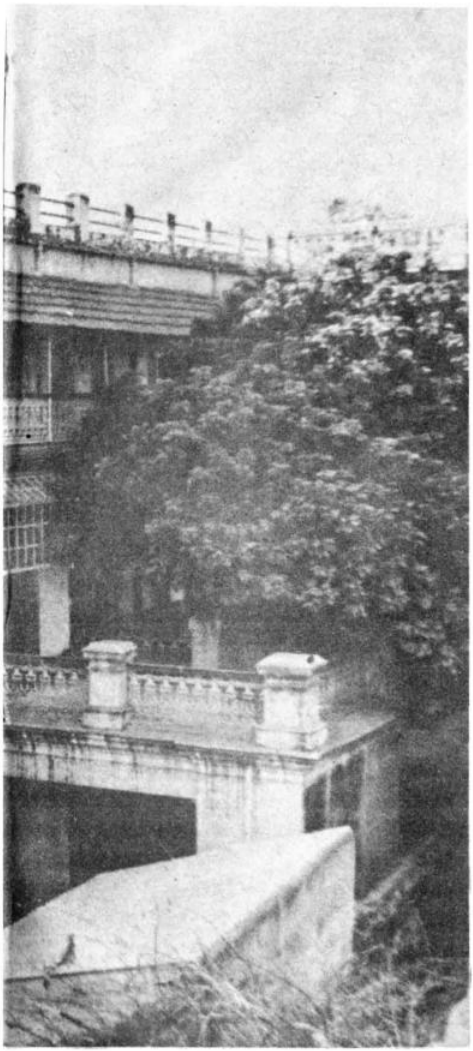

এবিষয়ে তাঁকে জানায়। রাঙাকাকাবাবু নিয়মিত রেডিও শুনতেন এবং যুদ্ধের গতি খুব মনোযোগ দিয়ে অনুসরণ করতেন। সেই সময় জার্মানরা ইংরেজদের বেশ নাস্তানাবুদ করছে। শুনে রাঙাকাকাবাবু খুব উৎফুল্ল হতেন, আমরাও হতাম। জেলে থাকতেও তিনি রেডিও শুনতেন, তাঁর সেলে রেডিও দিতে সরকারকে তিনি বাধ্য করেছিলেন। রাঙাকাকাবাবুরই প্রেরণায় দেশ-বিদেশের রেডিও শোনা আমারও নেশায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। যাঁরা কৌতূহলী, রাঙাকাকাবাবু তাঁদের বলে দিলেন যে, আমি বিদেশী স্টেশন ভাল ধরতে পারি, সেজন্য এ-ব্যাপারে তিনি আমার সাহায্য নেন। কিন্তু এমন অনেক লোক আছেন, যাঁদের কৌতূহল মিটলেও সন্দেহ যায় না। এমনই একজন ছিলেন আমাদের পালানকাকা। প্রায়ই দেখতাম ঘরের সামনের দরজাটা একটু ঠেলে উঁকি মেরে দেখতেন, রাঙাকাকাবাবু আর আমি কী করছি। দেখে নিয়েই দরজাটা আবার টেনে দিতেন। পালানকাকা খুব সরল প্রকৃতির, কিন্তু বেশ মজার লোক ছিলেন। দাদাভাইয়ের একমাত্র বোনের একমাত্র ছেলে। বাবা-রাঙাকাকাবাবুর একমাত্র পিসিমার বিয়ে হয়েছিল আমাদেরই গ্রামের পাশে রাজপুরের এক ভাল পরিবারে। দাদাভাই কলকাতায় এলে বাবার পিসেমশাই প্রায়ই এলগিন রোডের বাড়িতে দিন কাটিয়ে যেতেন। একতলার বারান্দায় বসে বৃদ্ধ ভদ্রলোক বড় একটা আলবোলা থেকে আরাম করে তামাক খেতেন। চঞ্চলমতি ছেলের গতিবিধি সম্বন্ধে তাঁর খুব চিন্তা হত, কেবলই 'কোথায় গেল' 'কোথায় গেল' করে হাঁকডাক করতেন। হুঁকোয় টান দিতে-দিতে ঝিমুতে-ঝিমুতে বলতেন, "পালান পালিয়ে গেল, হারান হারিয়ে গেল।" পালানকাকার ভাল নাম ছিল হারানচন্দ্র মিত্র। পালানকাকা কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই বসুবাড়িতে মানুষ হয়েছিলেন। প্রথম জীবনে কটকে, পরে কলকাতায়। চাকরি-জীবনেও তিনি হয় এলগিন রোড নয় উডবার্ন পার্কের বাড়িতে থাকতেন। তাঁর স্বাস্থ্য খুব ভাল ছিল। খেলাধুলোয় বেশ পটু ছিলেন। তাছাড়া তিনি খুব ভাল ম্যাসাজ করতে পারতেন। তিনি প্রায়ই রাঙাকাকাবাবুর গা-হাত-পা টিপে দিতেন। আমাদের মতো ছোটদের মন পেতে হলে বলতেন, "তোমার মাথাটা তো ধরেছে মনে হচ্ছে, এসো না একটু টিপে দিই।"

পালানকাকা ইলাকে বললেন, আমি যে রোজ সন্ধ্যায় ঘর বন্ধ করে রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে আলাদা কথা বলি, সেটা যেন কেমন-কেমন ঠেকছে! শুনে রাঙাকাকাবাবু ঠিক করলেন, পালানকাকাকে কোনওমতে কোথাও চালান

করে দিতে হবে। সে-সময় পালানকাকা বেকার। একটা চাকরি জোগাড় করে দেবার জন্য রাঙাকাকাবাবুকে খুব পীড়াপীড়ি করছিলেন। রাঙাকাকাবাবু জামশেদপুরে টাটা কোম্পানির বড়সাহেবের কাছে একটা চিঠি লিখে দিলেন। সেটা নিয়ে পালানকাকাকে জামশেদপুরে গিয়ে ধর্না দিতে বললেন। তাঁকে বোঝালেন, এতদিন বেকার থাকার মতো লজ্জার আর নেই। "চিঠি দিলাম, তুমি টাটানগরে গিয়ে গ্যাঁট হয়ে বোসো, যতদিন না চাকরি হচ্ছে সেখান থেকে নড়বে না।" পালানকাকা গ্যাঁট হয়ে বসেই রইলেন, ইতিমধ্যে আমাদের কাজ সমাধা হয়ে গেল।

পালানকাকার সরল প্রকৃতির সুযোগ নিয়ে রাঙাকাকাবাবুর অন্তর্ধানের কিছুদিন পরে শত্রুপক্ষ তাঁকে ব্যবহার করতে চেষ্টা করেছিল। ইলাকে পালানকাকা একদিন এসে বললেন, "ওরা বলছে আমাকে বেশ কিছু টাকাপয়সা দেবে, যদি আমি ছোড়দার পালানো সম্বন্ধে কিছু খবর জোগাড় করে দিতে পারি।" বোধহয় ইলা ব্যাপারটা জানে মনে করেই তিনি সোজাসুজি পুলিশের কারসাজি ফাঁস করে দিলেন।

এলগিন রোডের বাড়িতে লোক অনেক, আত্মীয়-স্বজন ও নানা ধরনের বাইরের লোক ক্রমাগতই আসেন। জীবনযাত্রার ধরন-ধারণ স্বাভাবিকভাবেই নানারকম। তাছাড়া চাকরবাকরের সংখ্যাও কম নয়, তারা সারা বাড়িতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে। নতুনকাকাবাবুর একটা বড় অ্যালসেশিয়ন কুকুরও আছে, সে আবার এর-তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, বিশেষ করে রাত্রে। আমি যখন ওই বাড়ি থেকে লুকিয়ে বেরোবার পথ ও উপায় সম্বন্ধে ভাবছি, রাঙাকাকাবাবু তখন সম্পূর্ণ এক ভিন্ন প্ল্যানের ভিত্তিতে আলোচনা আরম্ভ করলেন। বললেন, "এত লোকের মধ্যে এ-বাড়িতে ব্যাপারটা আয়ত্তে রাখা শক্ত। ধরো, এ-বাড়ি থেকে আমি খোলাখুলিভাবেই চলে গেলাম। আমার স্বাস্থ্য যে খারাপ, সে-কথা তো সকলেই জানে। স্বাস্থ্য উদ্ধারের অজুহাতে কোথাও চলে যাই, সেখান থেকে যথাসময়ে উধাও হয়ে যাব।"

আবার নতুন করে চিন্তা আরম্ভ হল।

(ক্রমশ)

বিজ্ঞানের যুগে

আজ পৃথিবী জুড়ে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা।

বিজ্ঞান শুধু যে মহাকাশে মানুষ পৌঁছে দিচ্ছে তাই নয়। বিজ্ঞান আজ আমাদের দৈনন্দিন জীবনকেও প্রভাবিত করেছে। আমাদের পুরো জীবনযাত্রাটাই আজ বিজ্ঞান নির্ভর।

সেই জন্য আমাদের চাই বিজ্ঞান সচেতনতা। খুব বড় কোন কথা নয়। ছোট্ট ছোট্ট ব্যাপারে চোখ কান খুলে রাখা দরকার। তোমাদের, যারা খুব ছোট ছোট, তাদের বলছি।

খুব মন দিয়ে দাঁত মাজা দরকার। বিশেষতঃ রাত্রে ঘুমোতে যাবার আগে। রাতের খাবারের টুকরো যেন দাঁতের ফাঁকে না থেকে যায়। দরকার বারে বারে কুলকুচো করে ধুয়ে ফেলা। নইলে ঐ সব খাবারের কণা সারা রাতে পচে দাঁতের গোড়ায় ব্যাক্‌টিরিয়ার জন্ম দেয়। আর এই সব অদৃশ্য ব্যাক্‌টিরিয়া কিছুদিনের মধ্যেই দাঁতের মধ্যে গর্ত করে ফেলে। তাছাড়া শরীর ও স্বাস্থ্যের জন্য বিজ্ঞান-ভিত্তিক আচার-বিধি পালন করা দরকার। যেমন পুষ্টিকর ও পরিমিত আহার, ব্যায়াম ইত্যাদি।

বিজ্ঞান মানেই ভয়ঙ্কর বড় কোন ব্যাপার নয়। ছোট্ট ছোট্ট বিষয়েও সচেতনতা আসা দরকার আমাদের মধ্যে। সবচেয়ে বড় দরকার হল, জিজ্ঞাসা বা জানবার ইচ্ছা। কেমন করে টেলিফোন, রেডিও, টেলিভিসন চলে আর কেমন করে চলে আমাদের শরীর ও মন।

(জনসংযোগ বিভাগ সি.এম.ডি.এ ৩এ, অকল্যাণ্ড প্লেস, কলকাতা-১৭ হ'তে প্রচারিত)

হারানো কাকাতুয়া

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আগের কথা : গবা কি সত্যিই পাগল ? উদ্ধববাবুর কেনা কাকাতুয়া বলে, "আলমারিতে টাকা নেই, অন্য জায়গায় আছে।" পাখিটিকে অনেকেই হাতাতে চায়। উদ্ধবের ছেলে রামুর গৃহশিক্ষক জর্দাপান খান। গবার ঘরে মধ্যরাতে যে ঢুকেছিল, তার মুখেও জর্দার গন্ধ। কাশিমের চরে হরিহর পাড়ুই খুন হয়। খুনের মামলার জেল-পালানো আসামি গোবিন্দ সার্কাসে ছদ্মবেশে খেলা দেখাত। পুলিশের সন্দেহ হওয়ায় সে গা ঢাকা দেয়।এদিকে গবার মাধ্যমে রামু তার সন্ধান পাবার পরে গোবিন্দর গোপন আশ্রয়ে আগুন লাগে। গোবিন্দ বেঁচে গিয়ে গবার সাহায্যে উদ্ধববাবুর বাড়িতে কাজ পায়। উদ্ধবের লোভী কর্মচারী নয়নকাজলকে দলে টেনে ইতিমধ্যে কাকাতুয়া ও রামুকে লুঠ করেছে ডাকাত সাতনা। গোবিন্দকে সঙ্গে নিয়ে গবা যায় কাশিমের চরে। সেখানে সে সাংকেতিক গান গায়। ডাকাতের হাতে মরতে-মরতে তারা ফিরে আসে। নয়নকাজল এখন অনুতপ্ত। তারপর..

॥ ২৪ ॥

যুধিষ্ঠিরবাবুর কামাই নেই, রোজ যেমন আসেন তেমনই আজও পড়াতে এসেছেন।

কিন্তু যাদের পড়াচ্ছেন তাদের পড়ায় মন নেই। রামুর দুই দাদা আর তিন দিদির মুখ ভার, চোখ ছলছল, গোঁজ হয়ে তারা বসে থাকে।

যুধিষ্ঠিরবাবু আজ বইপত্র খুললেন না, টাস্কও দেখলেন না। রামুর সবচেয়ে বড় দাদা সোমনাথকে জিজ্ঞেস করলেন, "রামুর কোনো খবর এখনো পাওয়া যায়নি, না ?"

সোমনাথ মাথা নেড়ে বলল, "না, আমাদের মা জল পর্যন্ত মুখে তুলছে না, বাবার চেহারা অর্ধেক হয়ে গেছে।"

যুধিষ্ঠিরবাবু গম্ভীরমুখে মাথা নেড়ে বললেন, "হুঁ, তা তোমার বাবার সঙ্গে একটু দেখা করা যাবে ?"

"হ্যাঁ। বাবা তো ঘরেই শুয়ে আছেন।"

"আমাকে একটু তাঁর কাছে নিয়ে চলো তো !"

উদ্ধববাবু আর একটা বিনিদ্র রাত কাটিয়ে সকালে উঠেছেন। যন্ত্রের মতো পুজো-আচ্চা সেরে এসে ঘরে শুয়ে পড়েছেন। বুকটা বড় কাঁপে আজকাল। মাথায় কত যে চিন্তা !

যুধিষ্ঠিরবাবুকে নিয়ে সোমনাথ ঘরে ঢোকার পর তিনি আস্তে আস্তে উঠে বসলেন। একটা চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে বললেন, "বসুন যুধিষ্ঠিরবাবু।"

যুধিষ্ঠির বসে বললেন, "রামুর খবরটা আমি বাইরের লোকের মুখে শুনেছি।"

উদ্ধববাবু কাতর স্বরে বললেন, "হ্যাঁ, বড্ড পাঁচকান হয়ে গেছে। এখন ভয় খবরটা জানাজানি হয়ে যাওয়ায় ওরা আমার ছেলেটাকে মেরে-টেরে না ফেলে।"

যুধিষ্ঠির গম্ভীর হয়ে বললেন, "আপনি পুলিশকে কি সব কথা জানিয়েছেন ?"

উদ্ধববাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, "হ্যাঁ, কুন্দকুসুম সবই জানে, বিচক্ষণ লোক। কিন্তু সেও তো কিছু করতে পারল না।"

যুধিষ্ঠির একটু হেসে বললেন, "আশ্চর্যের ব্যাপার কি জানেন উদ্ধববাবু, সবাই সবকিছু জানে। কিন্তু কাজের বেলা কেউই কিছু করতে পারছে না।"

উদ্ধববাবু বুক কাঁপিয়ে আর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, "করা হয়তো যেত। কিন্তু রামুকে আটকে রেখে ওরা আমাদের একেবারে জব্দ করে দিয়েছে। কাল রাতে এসে কুন্দকুসুম বলে গেল, কিছু করা সম্ভব নয়। তাহলেই ছেলেটার বিপদ। এই অবস্থায় আমারও মাথায় কিছু খেলছে না।"

যুধিষ্ঠির ভ্রুকুটিকুটিল মুখে বসে রইলেন চুপচাপ। হঠাৎ কুঁজোয় জল নিয়ে বাড়ির চাকরটা ঘরে ঢুকল। যুধিষ্ঠির আনমনে তার দিকে তাকালেন। তারপর হঠাৎ অন্যমনস্কতা ঝেড়ে ফেলে ভাল করে তীক্ষ্ণ নজরে দেখলেন লোকটাকে। খুব লম্বা নয়, মজবুত গড়ন, গালে কিছু দাড়ি। তবু তাঁর স্মৃতি চমকে উঠল।

সুপার রিন-এর শুভ্রতার অধিক চমক

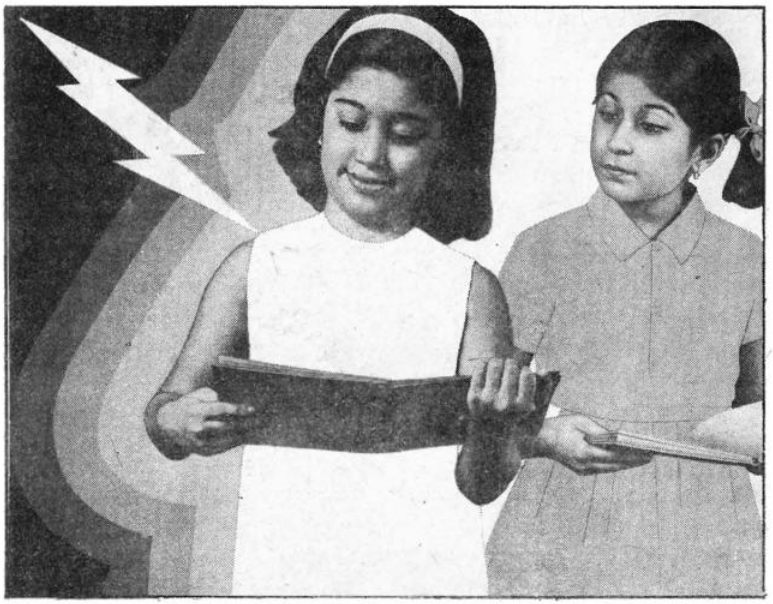

অন্য যে কোনো ডিটারজেন্ট টয়লেট বা বারের চেয়ে অনেক বেশী!

সুপার রিন-এর নিয়মিত ব্যবহার আপনার জামাকাপড়ের চেহারাকে পাল্টে এমনই চমক্‌দার করে তুলবে যা দূর থেকেও নজরে পড়বে!

সুপার রিন—অন্য যে কোনো ডিটারজেন্ট পাউডার বা বারে কাচা কাপড়ের চেয়ে অনেক বেশী ঝক্‌ঝকে সাদা ক'রে ধোয়। কারণ, সুপার রিন-এর শুভ্রতা আনার শক্তি যে অনেক বেশী!

চাক্ষুষ প্রমাণ করে নিন:

অন্য যে কোনো ডিটারজেন্ট বারে ধোয়া

সুপার রিন-এ ধোয়া

সুপার রিন-এ আছে শুভ্রতা আনার অনেক বেশী শক্তি!

হিন্দুস্থান লিভারের এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিনটাস-RIN.35-1810 BG

যুধিষ্ঠির সোজা হয়ে বসলেন। উদ্ধববাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, "এ বুঝি আপনাদের নতুন কাজের লোক?"

"হ্যাঁ। এই তো তিন দিন হল কাজে লেগেছে।"

যুধিষ্ঠির আর কিছু বললেন না। তবে চাকরটা চলে যাওয়ার পরও অনেকক্ষণ দরজার দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, "হুঁ।"

উদ্ধববাবু যুধিষ্ঠিরের মুখের দিকে চেয়ে ছিলেন। লোকটা কেমন তা বুঝতে পারছিলেন না। তবে গোপনে তিনি শ্রীধরবাবুর কাছে খোঁজ নিয়েছিলেন। শ্রীধরবাবুর ভাঙা পা এখনো সারেনি। তিনি অবশ্য ভরসা দিয়ে বলেছেন, যুধিষ্ঠির সম্পর্কে চিন্তা করবে না। অতি উত্তম ছেলে। আমি বহুকাল ধরে চিনি।

উদ্ধববাবু অবশ্য নিশ্চিন্ত হতে পারেন না। আজকাল তাঁর সকলকেই সন্দেহ হয়। তিনি যুধিষ্ঠিরের মুখের ভাবসাব দেখে সন্দিহান হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "ওকে চেনেন নাকি?"

যুধিষ্ঠির মাথা নেড়ে মৃদু হেসে বললেন, "না বোধহয়। চেনা-চেনা লাগছিল বটে, তবে কত মানুষের সঙ্গে কত মানুষের চেহারার মিল থাকে।"

এই বলে যুধিষ্ঠির উঠলেন। বললেন, "রামুর ব্যাপারে আমার যদি কিছু করার থাকে তবে আমাকে বলবেন। শত হলেও সে আমার ছাত্র। বলতে কী আমি অমন উজ্জ্বল বুদ্ধিমান ছেলে কমই দেখেছি।"

"বলেন কী?" উদ্ধববাবু অবাক হয়ে বলেন, "রামু উজ্জ্বল? বুদ্ধিমান?"

"ঠিক তাই। দুষ্টুমির স্টেজটা কেটে গেলেই সেটা বোঝা যাবে।"

উদ্ধববাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন।

যুধিষ্ঠির সন্তর্পণে বেরিয়ে এলেন। উঠোনের দিকটায় চাকরটা ভেজা কাপড়জামা মেলছে রোদ্দুরে। যুধিষ্ঠির চাপা স্বরে ডাকলেন, "ওহে, ও গোবিন্দমাস্টার।"

গোবিন্দ চমকে চিতাবাঘের মতো ঘুরে দাঁড়াল। চোখ ধকধক করে জ্বলছে।

যুধিষ্ঠির একটু হাসলেন। তারপর কাছে গিয়ে বললেন, "ভয় পেও না। একটু বাইরে নিরিবিলিতে চলো। তোমার সঙ্গে একটু কথা আছে।"

গোবিন্দর চোখের আগুনটা নিভে গেল। বলল, "আজ্ঞে।"

যুধিষ্ঠির গোবিন্দকে নিয়ে বাইরে এলেন। নিরিবিলি বকুলগাছটার তলায় দাঁড়িয়ে মৃদুস্বরে

বললেন, "আমাকে চিনতে পারো?"

গোবিন্দ মুখখানা ভাল করে দেখল। তারপর চাপা স্বরে বলল, "চিনি। হরিহর পাড়ুইয়ের ছেলে না তুমি?"

যুধিষ্ঠির মৃদু হেসে মাথা নাড়লেন, "ধরেছ ঠিক। আমার বাবা বড় ভাল লোক ছিল না। বদনামও ছিল খুব। সেইজন্য পৈতৃক পদবীটা আজকাল আর ব্যবহার করি না। এখন আমি যুধিষ্ঠির রায়।"

গোবিন্দ কঠিন স্বরে বলল, "কী চাও? বাপের খুনিকে পুলিশে ধরিয়ে দেবে?"

যুধিষ্ঠির গম্ভীর হয়ে বললেন, "না। আমার বাবা যেসব পাপ করেছিলেন তাতে তাঁর খুন হওয়া কিছু বিচিত্র ছিল না। তাঁর খুনির ব্যবস্থা সরকার করবে। আমার তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই। কিন্তু আমি জানতে চাই তুমি কোন্ দলে! কেনই বা এ-বাড়িতে চাকর সেজে আছ?"

গোবিন্দ খুব তীব্র দৃষ্টিতে যুধিষ্ঠিরকে দেখছিল। হরিহরের ছেলে লেখাপড়া শিখেছে বলে সে জানে। হরিহরও বলত তার ছেলে নাকি তার মতো নয়। গোবিন্দ একটা শ্বাস ফেলে বলল, "তোমার হয়তো বিশ্বাস হবে না, হরিহরকে আমি খুন করিনি।"

"হতে পারে। এখন আসল কথা বলো। তুমি এখানে কী করছ? চাকর সেজে থাকলেই তো চলবে না। যদি বুঝি তোমার মতলব খারাপ তাহলে উদ্ধববাবুকে তোমার আসল পরিচয়টা আমাকেই দিতে হবে।"

গোবিন্দ একটু হেসে বলল, "উনি জানেন। আমি রামুর দলে। সাতনার দলে নেই।"

যুধিষ্ঠির একটু অবাক হয়ে বললেন, "সাতনা! সে আবার এর মধ্যে আছে নাকি?"

"আছে। দলের সর্দার না হলেও সে বেশ পাণ্ডা গোছের লোক। আমার ধারণা হরিহরকেও সে-ই খুন করেছিল।"

যুধিষ্ঠির একটু আনমনা হয়ে যান। অনেকক্ষণ দূরের দিকে তাকিয়ে থেকে আস্তে আস্তে বলেন, "সাতনা!"

"সাতনাকে আমিও চিনতাম। সে লোক খারাপ ছিল না।"

যুধিষ্ঠির ব্যথিত মুখে মাথা নেড়ে বলেন, "তার মেয়েটা চুরি যাওয়ার পর থেকেই সে মানুষ থেকে জানোয়ার হয়ে গেল। তা শোনো গোবিন্দমাস্টার, যদি সাতনার দলই রামুকে চুরি করে থাকে তাহলে একটা উপায় হয়তো করা যাবে।"

"তার মানে?"

যুধিষ্ঠির ব্যথিত মুখে বললেন, "সাতনার মেয়েটাকে চুরি করেছিলেন আমার বাবাই। বাবার কী মতলব ছিল জানি না। হয়তো সাতনার কাছ থেকে কিছু আদায় করা। কিন্তু চুরি করলেও মেয়েটাকে বাবা মেরে ফেলেননি। আমার এক নিঃসন্তান মাসির কাছে রেখে এসেছিলেন। যতদূর জানি মেয়েটা এখনো সেখানেই আছে। যত্নে আছে। সাতনাকে বহুবার খবরটা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। পারিনি।"

"বলো কী!" গোবিন্দর চোখ কপালে উঠল।

"ঠিকই বলছি। তুমি যদি খবরটা সাতনার কাছে পৌঁছে দিতে পারো তাহলে হয়তো কাজ হবে। বলবে রামুকে ফেরত দিলে সে তার মেয়েকে ফেরত পাবে।"

উত্তেজিত গোবিন্দ কাঁপতে কাঁপতে বলল, "তোমার মাসির ঠিকানাটা?"

যুধিষ্ঠির মৃদু হেসে বললেন, "ওটা এখন গোপন থাক। তবে নিশ্চিন্ত থাকো, মেয়েটা আছে। আগে খবরটা সাতনার কানে পৌঁছে দাও। তারপর যা করার আমিই করব।"

"তোমার কথা কি সাতনাকে বলব?"

"না বলাই ভাল।" যুধিষ্ঠির মাথা নেড়ে বলেন, "কারণ যে-গুপ্তধনের জন্য তোমরা সবাই হন্যে হয়ে গেছ তার আসল উত্তরাধিকারী আমিই। কিন্তু আমি ওসব দাবি করব না। আমি চাই গুপ্তধন উদ্ধার হলে তা সরকারের তহবিলে জমা হোক। সাতনা জানে যে আমিই ওই গুপ্তধনের ওয়ারিশ। কাজেই আমি বেঁচে আছি জানলে সে আমাকে খুন করতে চাইবে।"

গোবিন্দ বলে, "তাহলে কী বলব? সাতনা কি আমাদের কথা বিশ্বাস করবে?"

"করবে। মেয়েটার একটা ছবি আমার কাছে আছে। সেটা ওকে দিও। তাহলে বিশ্বাস করবে।"

(ক্রমশ)

ছবি দেবাশিস দেব

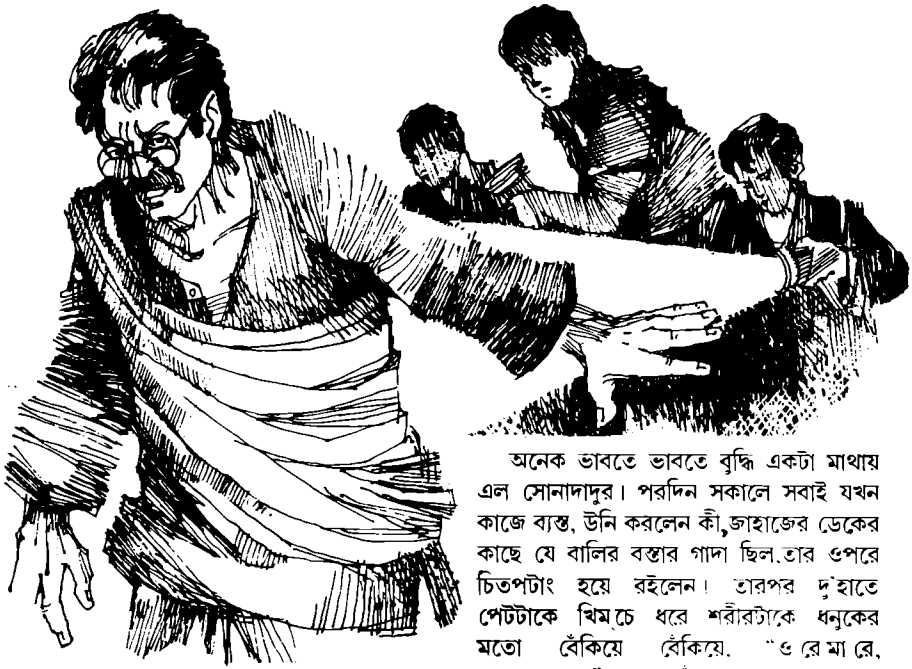

সোনাদাদুর রহস্য

কণা বসুমিশ্র

ভুতুমের সোনাদাদু একজন পয়লা নম্বরের হীরো। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় উনি নাকি শখ করে মিলিটারির খাতায় নাম লিখিয়েছিলেন। কাজটা অবশ্য খালাসি গোছের। জাহাজে মাল ওঠানো আর নামানো। দুধ-ঘি-খাওয়া শরীরে অত পরিশ্রম কি আর বেশিদিন সয়? দু'দিনেই সোনাদাদু খুব কাহিল হয়ে পড়লেন। তারপর যেদিন শুনলেন তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্রে চালান করা হবে, সেদিন তো সোনাদাদুর প্রাণ একেবারে ত্রাহি মধুসূদন!

সারা রাত না ঘুমিয়ে মতলব ভাঁজলেন সোনাদাদু, কী করে মিলিটারির খাতা থেকে নাম কাটান যায়। বন্ধুদের সঙ্গে বাজি রেখেই না তিনি এ-কাজ করতে গেছলেন! কোথায় সেই বন্ধুরা? হাতের কাছে একবার পেলে হত।

অনেক ভাবতে ভাবতে বুদ্ধি একটা মাথায় এল সোনাদাদুর। পরদিন সকালে সবাই যখন কাজে ব্যস্ত, উনি করলেন কী, জাহাজের ডেকের কাছে যে বালির বস্তার গাদা ছিল, তার ওপরে চিতপটাং হয়ে রইলেন। তারপর দু'হাতে পেটটাকে খিমচে ধরে শরীরটাকে ধনুকের মতো বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে, "ও রে মা রে, ও রে বাবা রে" বলে চেঁচাতে লাগলেন।

তখনো তো ভারত স্বাধীন হয়নি। জাহাজে ছিলেন একজন ইংরেজ ডাক্তার। তিনি ঘাবড়ে গিয়ে ইংরিজি ছেড়ে একেবারে হিন্দিতেই "কেয়া হুয়া, কেয়া হুয়া" বলে চেঁচিয়ে উঠলেন। সোনাদাদু কোনো উত্তর দেন না। শুধু পেট ধরে চেঁচান। ওঁর চেঁচানিতে ওখানে রীতিমত ভিড় জমে গেল। ডাক্তারসাহেব ব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি একটা বড়ি দিলেন। সোনাদাদু বড়িটা খাবার ভান করে কোনো এক সময় টুপ করে ফেলে দিলেন জলের মধ্যে। তারপর পেট ধরে একবার বাথরুমে ছোটেন, আবার ফিরে আসেন। ডাক্তারসাহেব তখন অনুমান করলেন, নিশ্চয় কলেরা। উনি তাড়াতাড়ি ইনজেকশনের সিরিঞ্জ নিয়ে এলেন। তাই দেখেই সোনাদাদু আর একবার ছুটে বাথরুমে গেলেন।

বাথরুমের ফুটোটা নেহাত ছোট ছিল না। সোনাদাদু সেই ফুটোর মধ্যে নিজের শরীরটা গলিয়ে দিলেন। ডুবতে ডুবতে জলের বেশ খানিকটা গভীরে তলিয়ে গেলেন উনি। সাঁতারে তো ওস্তাদ বরাবরই। ডুবসাঁতার কেটে কেটে সোনাদাদু বহুদূরে জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে উঠলেন। তারপর ছুট ছুট।

এসব তো সোনাদাদুর যৌবনের গল্প। বুড়ো বয়সের গল্প তো বলাই হয়নি।

এই সেদিন রাতে, বাইরে যখন প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি হচ্ছিল, সবাই ঠাণ্ডায় হি-হি করে কাঁপতে-কাঁপতে লেপের তলায় গিয়ে ঢুকল। আসামের ঠাণ্ডা তো। তারপর আবার পাহাড়ি অঞ্চল। ভুতুমের হঠাৎ মনে হল, সোনাদাদু কোথায়?

সোনাদাদুর ঘরটা ছিল বাড়ির একেবারে শেষ মাথায়। বাগানঅলা প্রকাণ্ড বাড়ি, ভুতুমের দাদুর বাবার আমলের তৈরি। এ-ঘর সে-ঘর উঁকি দিতে দিতে ভুতুম সোনাদাদুর ঘরে গিয়ে হাজির হ'ল। অন্ধকার ঘর। খাটিয়ার ওপর পরিষ্কার মশারি গোঁজা। কিন্তু মশারির জালের মধ্যে কালো, নিকষ কালো কী একটা মনে হচ্ছে না? ভুতুমের বুকটা ঢিপ্ ঢিপ্ করে। ভূত-টুত নয়তো। এই ঘরেই তো ভুতুমের বাবার এক জেঠি মারা গেছলেন!

"ভূত আমার পুত। পেত্নি আমার ঝি. রাম লক্ষ্মণ বুকে আছে করবি আমায় কী?" এই বলতে বলতে ভুতুম সাহস করে সুইচে হাত দিল। খুট করে আলোটা জ্বলে উঠতেই ভুতুম দেখে, মশারির মধ্যে ছাতা খুলে মাথায় দিয়ে বসে আছেন সোনাদাদু।

"সোনাদাদু, সোনাদাদু, কী হল তোমার?" ভুতুম মশারির কোনা তুলে সোনাদাদুর গায়ে একটা ধাক্কা মেরে বলল, "তুমি ছাতা খুলে বসে আছ কেন?" সোনাদাদু জবাফুলের মতো লাল টকটকে চোখ দুটো তুলে বললেন, "দেখছিস না বৃষ্টি পড়ছে?"

ভুতুম বুঝল, সোনাদাদু আজও সাধুদের আখড়ায় গিয়ে সিদ্ধি খেয়ে এসেছেন!

ভুতুমের সোনাদাদুর আর এক কীর্তির কথা ভাবলে ভুতুমের হাসি পায় না, দুঃখই হয়।

ঘটনাটা এই, ভুতুমরা এই গত বছর একটা নাটক করেছিল। নাটকের শিল্পীরা ভুতুমের কাকা-জ্যাঠার ছেলেমেয়েরা আর পাড়ার দু'একজন বন্ধু-বান্ধব। কদিন ধরে তো চলল জোর রিহার্শাল। ভুতুমরা আগেভাগেই সোনাদাদুকে সভাপতি বানিয়ে রাখল। ছোটদের মহলে তো উনি কম জনপ্রিয় নন! ভুতুম কড়া গলায় সোনাদাদুকে বলল, "সোনাদাদু, সেদিন কিন্তু তুমি ভুলেও কোথাও চলে-টলে যাবে না।"

সোনাদাদু বললেন, "তথাস্তু। কিন্তু সভাপতি হয়ে আমায় কী করতে হবে?"

ভুতুমরা বলল, "বক্তৃতা দিতে হবে, হাততালি দিতে হবে, এইসব।"

খুশি হয়ে মাথা নাড়লেন সোনাদাদু। বললেন, "ঠিক হ্যায়। তার বদলে তোরা আমায় কী দিবি?"

"রসগোল্লা খাওয়াব সোনাদাদু। সভাপতিকে না খাইয়ে কি বিদায় করা যায়?"

নাটকের দিন সকাল থেকে ভুতুমরা সোনাদাদুকে গার্ড দিয়ে রাখল, পাছে তিনি কখন চড়াইপাখির মতো ফুড়ত করে উড়ে যান। সোনাদাদু ওদের পিঠ চাপড়ে বললেন, "ঘাবড়াও মত্। কথা যখন দিয়েছি, তখন তোমাদের রসগোল্লা আমি খাবই।"

শতরঞ্জি, বিছানার চাদর আর জেঠি কাকিদের কাপড়-চোপড় দিয়ে তো কোনোরকম প্যাণ্ডেল বাঁধা হল সোনাদাদুর ঘরের পাশের বাগানে। এ-ব্যাপারে সোনাদাদুও কম উৎসাহী নন। উনিও ওদের প্রচুর সাহায্য-টাহায্য করলেন।

কিন্তু সন্ধের আগে, নাটক যখন শুরু হয়-হয়, ভুতুমরা যখন মেক-আপ নিতে ব্যস্ত, তখন হঠাৎ দেখা গেল সোনাদাদু উধাও। খোঁজ, খোঁজ. সভাপতিকে কোথাও পাওয়া গেল না। এদিকে তো দর্শকরা আসতে শুরু করেছেন। এ-বাড়ি ও-বাড়ির লোক মিলে জনা-তিরিশেক তো হয়েইছে। মাটিতে পাতা শতরঞ্জির ওপর বসে দর্শকরা রীতিমত গুঞ্জন শুরু করে দিয়েছেন। তবু সভাপতির পাত্তা নেই। মাইক তো আর নেই। ভুতুম সোজা কোটালের বেশেই স্টেজে দাঁড়িয়ে হাত দুটোকে চোঙের মতো করে চেঁচিয়ে বলল, "আমাদের নাটক আরম্ভ হতে আর দেরি নেই। সভাপতি,আপনি যেখানেই থাকুন ফিরে আসুন।" তবু কেউ সভাপতিকে দেখতে পেল না। নাটকের রাজা উজিরদের মধ্যে রীতিমত ঝগড়াঝাটি শুরু হয়ে গেল নতুন কাকে সভাপতি করা যায় তাই নিয়ে। সভাপতির অভাবে নাটক তো আর বন্ধ হতে পারে না!

অনেক তক্কাতক্কির পর সভাপতির জায়গায় শেষ পর্যন্ত ঠাকুমাকেই বসিয়ে দেওয়া হল। ঠাকুমার তো একটা দাঁত নেই, পান ছেঁচে খান।

কথা বলতে গেলে ফোকলামাড়ির ভেতর দিয়ে সব বেরিয়ে যায়। তবু তো চেয়ারটা দখল করে রয়েছেন উনি। সোনাদাদু এই ঠাকুমারই খুড়তুতো ভাই। বিয়ে-টিয়ে করেনি। চিরদিনই বাউণ্ডুলে, ভবঘুরে। তা সভানেত্রী সেজে ঠাকুমা খুশিই হলেন। বাড়ির এতগুলো নাতি-নাতনি থিয়েটার করছে, আর উনি দুটো হাততালি দিতে পারবেন না? ভুতুমরা ঠাকুমার গলায় মালা পরাতে পরাতে আর একবার চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিল। ইশ্! এখনও যদি সোনাদাদু আসেন তা হলে অন্তত প্রধান অতিথি তো তাঁকে করা যাবে।

সোনাদাদুর অভাবে নাটক খুব ভাল জমল না। কেমন যেন সুর কেটে গেল। তবু জোর হাততালি পড়ল ঠাকুমার। কিন্তু নাটক শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভুতুমরা অনেকে সোনাদাদুকে খুঁজতে বেরিয়ে গেল।

শেষপর্যন্ত সোনাদাদুকে পাওয়া গেল। প্যাণ্ডেলের বাইরে যেখানে ঝোপঝাড়, ঘুটঘুটে অন্ধকার, সেখানে একটা উঁচু মাটির ঢিপির ওপর বসে সোনাদাদু হাততালি দিচ্ছেন, আর বলছেন, "ফার্স্ট কেলাস! ফার্স্ট কেলাস।"

ভুতুমের টর্চের আলোটা গিয়ে পড়ল একেবারে সোনাদাদুর মুখের ওপর। "সোনাদাদু, তুমি এখানে?"

মশা তাড়াতে তাড়াতে সোনাদাদু জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন, "বা রে, তোদের অভিনয় দেখব না!"

"এই জঙ্গলের মধ্যে বসে তুমি কী অভিনয় দেখছ, সোনাদাদু?" ভুতুম প্রায় কেঁদেই ফেলল। তারপর ধমকের সুরে বলল, "তুমি ফের সাধুর আখড়ায় গেছিলে সিদ্ধি খেতে? আমাদের নাটকের সভাপতি হবার সময়টুকুও তুমি পেলে না?"

সোনাদাদু তখন হাসছেন হো-হো হি-হি। হাসতে হাসতেই বলছেন, "আমি তো সভাপতিই হয়েছি, এই যে তোদের নাটক দেখছি।"

ভুতুম আজও বুঝতে পারেনি সেদিন সোনাদাদু সত্যিই সিদ্ধি খেয়েছিলেন, নাকি নাতি-নাতনিদের সঙ্গে আর-এক নাটক করেছিলেন?

ছবি অনুপ রায়

ছবির মজা

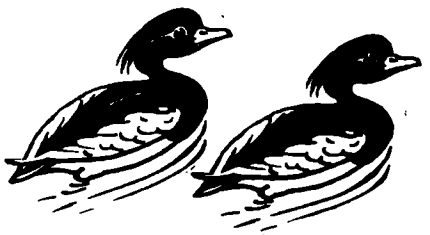

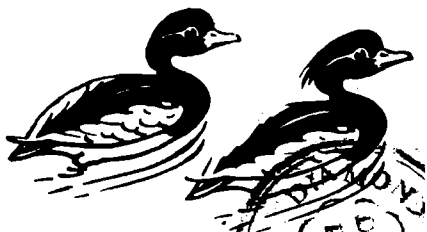

চারটে হাঁসই কি হুবহু একরকম?

(না, নীচের বাঁ দিকের হাঁসের মাথায় ঝুঁটি নেই।)

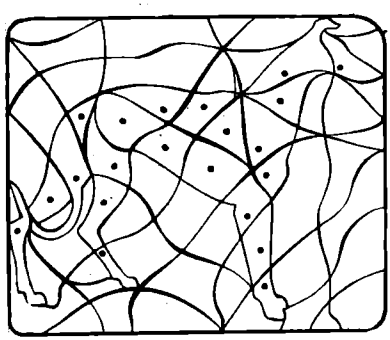

ফুটকি-দেওয়া ঘরগুলিকে পেনসিল বুলিয়ে ভরাট করলেই দারুণ দৌড়বাজ একটা কুকুর পেয়ে যাবে।

উপকারের প্রতিদান

পবিত্র সরকার

শোন্ রে পাঁচু, শোন্ রে পাঁচি,
শুক্রবারে রাত বারোটায়
এক্কেবারে কাঁটায় কাঁটায়
উলটে গেল চোদ্দটা ট্রেন
সাঁতরাগাছি, কাঁকুড়গাছি।
মস্কোতে ও দামাস্কাসে
সেলুনে লোক দেখল ত্রাসে
গোঁফ না ছেঁটে নাপিত ভায়া
নাকের ওপর চালায় কাঁচি।
আফ্রিকাতে জংলা ঝিলে
তিনশোটা জল-হস্তী মিলে

ছবি দেবাশিস দেব

হঠাৎ দেখে তাদের গায়ে
বেরিয়ে গেছে খুব ঘামাচি।
সিন্ধুঘোটক শূন্যে লাফায়,
আঁকড়ে ধরে সামনে যা পায়,
বিকট সুরে চেঁচায় হাতি
"কোথায় গেছি, কোথায় আছি!"
বাঘের শুনি কাতরানি খুব—
"কাজ কী বেঁচে, মলেই বাঁচি!"

একুশটা হয় জাহাজ-ডুবি
হাজার বাড়ি পড়ল শুয়ে,
থুম্বা থেকে লম্বা রকেট
থুবড়ে নাসা ঢুকল ভুঁয়ে।
বিশ্ব জুড়ে ঐ প্রলয়ে
রইল না আর বাছাবাছি।

শুক্রবারের রাত-নিশুতে
কোন্ দানবে, কোন্-সে ভূতে
চতুর্দিকে ধ্বংস হেনে
করল এমন নাচানাচি?

ঐ সময়ে মূল ঘটনার
ছিলাম বলে কাছাকাছি—
দেখতে পেলাম, জাপানজয়ী
পিৎসিকাতো মিৎসুমাচি—
মস্ত 'সুমো' কুস্তিগিরের
নাকে হঠাৎ ঢুকল মাছি।
তখন তিনি হাত-পা ছুঁড়ে,
দুই কানে দুই আঙুল পুরে
চোখ বুঁজে আর মুখটি খুলে
দিলেন গোটা-সাতেক হাঁচি।

শুক্রবারে রাত বারোটায়
সেই হাঁচিতে বিশ্ব কাঁপায়
দুর্ঘটনার সেই হল মূল,
মিথ্যে কথা নয় বাবাজি।
বলতে গিয়ে সেইটে, দেখি,
আরে আরে! কী হচ্ছে কী?
জাপটে ধরে সবাই আমায়
টিকিট কেটে পাঠায় রাঁচি!

লোকের ভাল করতে গেলে
এই বুঝি হয় কাণ্ডটা? ছিঃ!

রোভার্সের রয়
দু কোটি টাকার 'অফার' পেয়েও বসরানের কোচ হতে রাজি হয়নি রয়। কিন্তু বসরানের লোকেরা তার স্ত্রীকে ইতিমধ্যে হাত করেছে...
কী ব্যাপার, আমাকে না-জানিয়ে এদের সঙ্গে কথা বলছ কেন?
বেশ করেছি। তুমিও...
স্ত্রী পেনির মুখোমুখি হয়েছে রয়...
এ-ব্যাপারে আমাকে কিছু জানাওনি।
ভেবেছিলাম, তোমার ভাল লাগবে না।
দেশটা তো মরুভূমির মধ্যে
না না, আধুনিক জীবনের সবরকম সুবিধাই সেখানে মেলে।
বাজে কথা।
আমি ক্রীড়ামন্ত্রী। আমাদের প্লেনে বসরানে গিয়ে আপনার স্ত্রী স্বচক্ষে সব দেখবেন।
কেন?
বাঃ, আমাদের নতুন বাড়িটা কেমন হবে, দেখব না?
দাঁড়াও পেনি...
এই দ্যাখো!
ওরেব্বাবা!
ঘুরে দাঁড়াল রয়...
না পেনি, তবু আমি যাব না!
যেতে তোমাকে হবেই!

রেগে চলে গেল পোন...
ছিঃ, স্ত্রীকে দুঃখ দিচ্ছেন কেন?
স্ত্রীকে হাত করে আমার উপরে চাপ দিতে চান?
জেনে রাখুন, আমি যাব না!
দু দিন বাদে...
আমাকে বললে তৎক্ষণাৎ রাজি হতুম।
এত ভাল চাকরি আমি পেলুম না!
বিদায় রয়। বসরান থেকে ছবি পাঠাব।
সাবধানে থেকো।
কিচ্ছু ভাববেন না আপনি।
প্লেন আকাশে উঠল...
আমার মনে হয়, জায়গাটা পেনির পছন্দ হবে না...
কী বলো রয়?
কী জানি!
এইরকম মনমরা হয়ে থাকলে রয় খেলবে কী করে?
ডার্লটনের সঙ্গে খেলা
ডার্লটন! ডার্লটন!
রোভার্সকে হারাতেই হবে।
ড হলেই বাঁচি।
DARLTON
খেলা শুরু হল...
কী পাস, দেখলে?
রয় ভার্ননকে বল দিলেই গোল হবে!
কিন্তু...
রয় নিজেই শট নিল!
বারের উপর দিয়ে বেরিয়ে গেছে!
আমাকে দিলে না কেন, রয়?
রয়ের মাথার ঠিক নেই।
ফলে হেরে না যাই!
মন ঠিক নেই! তাই প্রতি পদে ভুল করছে রয়!
এর পরে আগামী সংখ্যায়

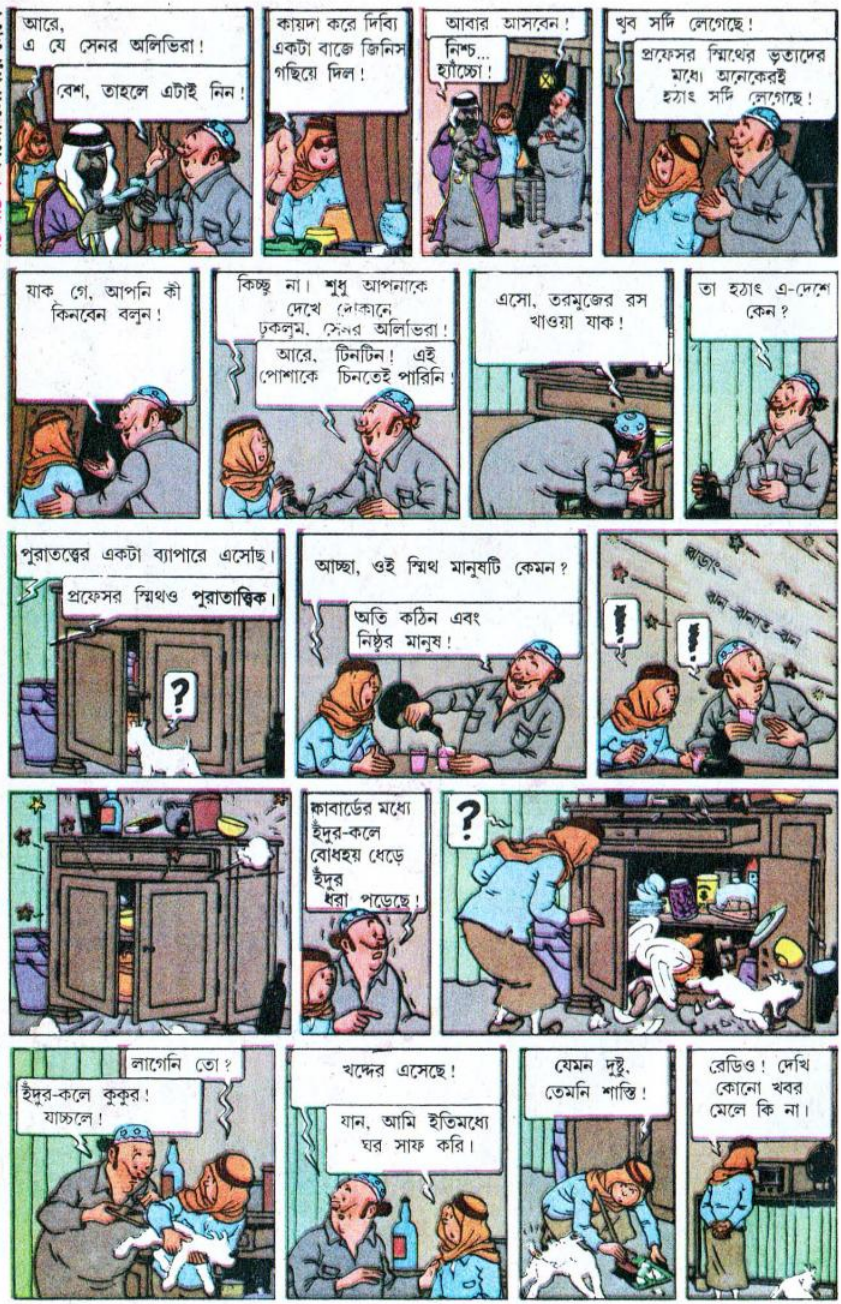

আরে,
এ যে সেনর অলিভিরা!
বেশ, তাহলে এটাই নিন!
কায়দা করে দিব্যি একটা বাজে জিনিস গছিয়ে দিল!
আবার আসবেন!
নিশ্চ... হ্যাঁচ্চো!
খুব সর্দি লেগেছে!
প্রফেসর স্মিথের ভৃত্যদের মধ্যে অনেকেরই হঠাৎ সর্দি লেগেছে!
যাক গে, আপনি কী কিনবেন বলুন!
কিচ্ছু না। শুধু আপনাকে দেখে দোকানে ঢুকলুম, সেনর অলিভিরা!
আরে, টিনটিন! এই পোশাকে চিনতেই পারিনি!
এসো, তরমুজের রস খাওয়া যাক!
তা হঠাৎ এ-দেশে কেন?
পুরাতত্ত্বের একটা ব্যাপারে এসেছি।
প্রফেসর স্মিথও **পুরাতাত্ত্বিক**।
?
আচ্ছা, ওই স্মিথ মানুষটি কেমন?
অতি কঠিন এবং নিষ্ঠুর মানুষ!
ঝড়াং—
ঝন-ঝনাত-ঝন
!
!
ক্যাবার্ডের মধ্যে ইঁদুর-কলে বোধহয় ধেড়ে ইঁদুর ধরা পড়েছে!
?
লাগেনি তো?
ইঁদুর-কলে কুকুর! যাচ্চলে!
খদ্দের এসেছে!
যান, আমি ইতিমধ্যে ঘর সাফ করি।
যেমন দুষ্টু, তেমনি শাস্তি!
রেডিও! দেখি কোনো খবর মেলে কি না।

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

১	২			৩	৪	
			৫			
৬		৭				৮
৯					১০	
		১১				
	১২				১৩	
১৪				১৫		

সংকেত : পাশাপাশি : (১) ফাঁদ। (৩) মরাঠা নেতৃবংশ। (৭) পালিভাষায় রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ। (৯) মহাভারতের এক মহাবীর। (১০) বিখ্যাত কবি। (১১) তাঁতি। (১৪) অস্ত্রবিশেষ। (১৫) বঙ্কিংয়ের প্রবাদপুরুষ।

উপর-নীচ : (২) দেব-সেনাপতির নামে পদবি। (৪) কোন্ নদী রক্তের প্রতিশব্দ? (৫) জয়দেব-রচিত কাব্যগ্রন্থ। (৬) নজরুলের একটি বিখ্যাত কবিতা। (৮) পঞ্চপাণ্ডবের তিনজন। (১২) কুস্তিগির। (১৩) রাগিণীবিশেষ।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

চাঁ	দা		ম		বা	গ
চ		ব	ৎ	স		বা
র	বি		কু		অ	ক্ষ
	জ্ঞা		ণ		স্তে	
ক	প	ট		কা	বা	ব
ব	ন		মা		সী	স
স্ক		বি	ষা	ণ		স্ত

ছোট্‌কা সেদিন সেজদাদুকে দেখে অবাক। খাবার টেবিলে বসে সেজদাদু গোটাচারেক চামচ নিয়ে একবার করে কী যেন হিসেব করছে, তারপর কখনও একটা চামচ নিয়ে দূরে রাখছে, কখনও-বা দুটো চামচ নিয়ে কী যেন বিড়বিড় করতে-করতে বলছে, কখনও তিনটি চামচই দূরে সরিয়ে রাখছে, আবার নিজেই আপনমনে এমনভাবে ঘাড় নেড়ে যাচ্ছে যে, মনে হয় মারাত্মক কোনও ভুল হয়ে গেছে কোথাও, সবকটা চামচ জড়ো করে ফের শুরু করছে।

ছোট্‌কা আমাকে ইশারা করতেই আমি সেজদাদুকে ধরলাম, "কী খেলছ সেজদাদু, চামচ নিয়ে আমাকে শেখাবে?"

সেজদাদু মুখ তুলে তাকিয়ে আমাদের দুজনকেই দেখতে পেল। তারপর হেসে বলল, "চামচের খেলা নয়, আসলে একটা ধাঁধার উত্তর মেলাচ্ছিলাম। তা ভালই হল, তোমরা এসে গেছ। তোমাদের বরং ধাঁধাটাই বলি। খুব পুরনো ধাঁধা, আমাদেরও ঠাকুর্দার আমলের। কিন্তু তাতে কী, ধাঁধাটা ভাল।"

ছোট্‌কা সবাইকে চমকে দিয়ে হঠাৎ বলল, "সেই বাঘ-ছাগল-পান নিয়ে ধাঁধাটা তো? সত্যি, খুবই ভাল ধাঁধা। সতুবাবুদেরও জেনে রাখা উচিত।" আমি তো জানবই, কিন্তু চামচ থেকে কী করে বাঘ-ছাগল-পান-এ চলে গেল ছোট্‌কা, সেটা আমার কাছে আরও বিস্ময়কর। যাহোক, ধাঁধাটাই বলি।

প্রথম ধাঁধা ॥ নদী পার হতে গিয়ে সমস্যায় পড়ে গেছে একটি লোক। তার সঙ্গে রয়েছে একটি বাঘ, একটি ছাগল আর কিছু পান। আর তার সামনে রয়েছে একটি নৌকো, যে-নৌকোয় চড়ে সে নদী পেরিয়ে অন্য পারে যাবে। নৌকোটা এমনই ছোট যে, লোকটা একবারে হয় পান নিয়ে পেরোতে পারে, অথবা ছাগল নিয়ে, অথবা বাঘ নিয়ে। একেকবারে একেকটা জিনিস নিয়ে পার হতে হবে তাকে। কিন্তু আরেকটা মুশকিল, লোকটা চোখের আড়াল হলেই বাঘটা ছাগলটাকে খেয়ে ফেলবে, কিংবা ছাগলটা খেয়ে ফেলবে পানের বাণ্ডিল।

বলতে পারো, কীভাবে সবকটা জিনিস নিয়ে লোকটা নদী পার হবে? একবারে তো হবেই না, কিন্তু ক'বারে হবে, এবং এমনভাবে হবে যে বাঘটাও ছাগল খাবার ফুরসত পাবে না, ছাগলটাও খেতে পারবে না পান?

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ বাবা হিসেব করে দেখলেন ছেলেমেয়েদের প্রত্যেককে যদি একটা করে পেয়ারা দেওয়া হয়, একটা পেয়ারা তাঁর নিজের জন্য থাকে, আর ছেলেমেয়েদের প্রত্যেককে যদি দুটো করে পেয়ারা দেন তিনি, তাহলে একজন পায়ই না। বলতে পারো, ক' ছেলেমেয়ে, কটাই বা পেয়ারা?

তৃতীয় ধাঁধা ॥ শব্দটার জট ছাড়াও—

অ ব তা ন ধা ন

গতবারের উত্তর ॥ (১) মিঃ উকিল ঘটকালি করেন, মিঃ ঘটক সংবাদপাঠক, মিঃ বণিক ওকালতি করেন, মিঃ পাঠক ব্যবসায়ী। (২) বর্ণমালার পর-পর দুটি বর্ণ দিয়ে প্রতিটি শব্দ শুরু হচ্ছে—গঠনগত এইটুকুই মিল।

(৩) ৮৮৮+৮৮+৮+৮+৮=১০০০।

সত্যসন্ধ

কিসের ফোটো

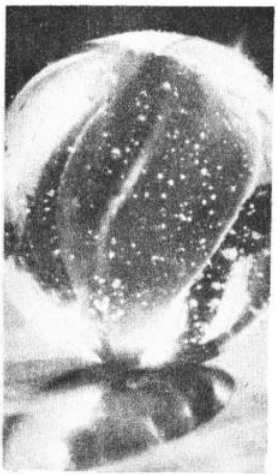

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যায় ছিল
ফোটো কর্নারের ফোটো

ফোটো : তপন দাশ

উত্তর বটে

প্রঃ আর কতক্ষণ বসে থাকব আপনার জন্যে?

উঃ এক ঘন্টা ধরে বলছি পাঁচটা মিনিট অপেক্ষা করো, কথাটা যে তোমার কানেই যাচ্ছে না!

প্রঃ পুরনো দিনের একটা খাট দেখলাম, কী মোটামোটা পায়া, এসব খাটকে কী বলে?

উঃ পায়াভারী।

প্রঃ কবরেজমশাই বললেন এ-ওষুধে পঞ্চাশ বছরের পুরনো রোগ সারে, আর আপনি বলছেন এটা ফেরত দিয়ে আসতে?

উঃ আমার বয়স যে মাত্র চৌত্রিশ।

প্রঃ কোন মোড়া ভাঙা অবস্থাতেই পাওয়া যায়?

উঃ আড়মোড়া।

সুসেন

মজার খেলা

এক প্যাকেট তাস থেকে দুটো টেক্কা, দুটো চার, দুটো দুই, দুটো আট, দুটো পাঁচ আর দুটো সাত ফোঁটাঅলা তাস আলাদা করে নিয়ে, নীচে যেমন দেখানো হল, সেভাবে, টেবিলে দুটো সারিতে সাজাও—

১ ৪ ২ ৮ ৫ ৭
১ ৪ ২ ৮ ৫ ৭

এবার কোনও বন্ধুর হাতে তুলে দাও একটা ছক্কা আর ছক্কাদান। সে লুডো খেলার মতো ছক্কাটা চালবে। এক উঠলে দু-বার চালবে, কেননা, দুই থেকে ছয় পর্যন্ত পাঁচটা সংখ্যার যে-কোনও একটা সংখ্যা তাকে ছক্কায় চেলে পছন্দ করতে হবে। এক পড়লে চলবে না।

খেলাটা কী, এবার তাকে বলো। ছক্কাতে এক ছাড়া যে-সংখ্যা উঠবে, সেই সংখ্যা হবে বন্ধুর মনোনীত সংখ্যা। আর তুমি সঙ্গে-সঙ্গে নীচের সারির তাসগুলোকে এমনভাবে এদিক-ওদিক করে সাজিয়ে দেবে যে, বন্ধু অবাক হয়ে দেখবে, ওপরের সারিকে মনোনীত সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে যা হয় ঠিক সেই ভাবে চোখের পলকে তাসগুলোকে সাজিয়ে দিয়েছ তুমি।

কীভাবে হবে ভাবছ? খুব সোজা। আসলে ১৪২৮৫৭ সংখ্যাটাই ম্যাজিকের মতো বিস্ময়কর। একে ২ থেকে ৬ পর্যন্ত যে-সংখ্যা দিয়েই গুণ করো না কেন, গুণফলে এই ছটা অঙ্কই ঘুরে-ফিরে আসবে। বিশ্বাস না হয়, গুণ করেই দ্যাখো! কী সংখ্যা উঠলে কী তাস সরাবে তার জন্যও গুণ করা দরকার। একটা উদাহরণ দিই। ধরো, বন্ধু ছক্কায় চালল তিন সংখ্যাটা। তুমি সঙ্গে-সঙ্গে নীচের সারির বাঁ দিকের টেক্কাটাকে নিয়ে একদম ডান দিকে বসিয়ে দিচ্ছ। অর্থাৎ তখন তাস সাজাচ্ছ এইভাবে—

৪ ২ ৮ ৫ ৭ ১

এই সংখ্যাটা ওপরের সারির—১৪২৮৫৭ সংখ্যার ঠিক তিনগুণ। কী ম্যাজিকের মতো খেলাটা, তাই না?

মজারু

হাসিখুশি

মাস্টারমশাই: যদি দুটো হাঁসের ডিমের দাম এক টাকা হয়, তা হলে একশো পয়সায় ক'টা ডিম পাওয়া যাবে? বলতে পারো বুকুন?

বুকুন: পারি স্যার। কিন্তু অঙ্কটা আর একবার বলুন।

মাস্টারমশাই ধমকের সুরে বললেন, "জলের মতো সোজা এই অঙ্কটা বলতে এত সময় লাগছে? আরে যদি দুটো হাঁসের ডিমের দাম এক টাকা—"

বুকুন: বুঝতে পেরেছি স্যার, আর বলতে হবে না। আপনি হাঁসের ডিমের দাম জিজ্ঞেস করছেন, আর আমি এদিকে মুরগির ডিমের দাম হিসেব করে চলেছি।

মাস্টারমশাই কুশলের মাথায় একটা গাঁট্টা মেরে বললেন, "তুমি ভয়ানক পাজি হয়েছ, তোমার বাবাকে একবার কাল আমার সঙ্গে দেখা করতে বোলো।"

"নিশ্চয়ই বলব স্যার, কিন্তু আপনার একশো কুড়ি টাকা ক্ষতি হয়ে যাবে।"

"মাস্টারমশাই রীতিমত অবাক হয়ে বললেন, "কেন, একশো কুড়ি টাকা ক্ষতি হবে কেন?"

"না, মানে, বাবা তো এ-শহরের সবচেয়ে নামকরা ডাক্তার। কোথাও গেলেই একশো কুড়ি টাকা ফী নেন।"

●

ডাক্তার: আপনার অসুখ সারাবার জন্য আপনাকে যা-যা করতে বলেছিলাম, করেছিলেন? জানালা খুলে শুয়েছিলেন তো?

রোগী: হ্যাঁ, ডাক্তারবাবু।

ডাক্তার: আপনি এখন কেমন বোধ করছেন?

রোগী: খুব খারাপ। উপরন্তু, জানালা খুলে শোবার জন্য আমার কলম, লাইটার, হাতঘড়ি চুরি গেছে।

ছবি দেবাশিস দেব

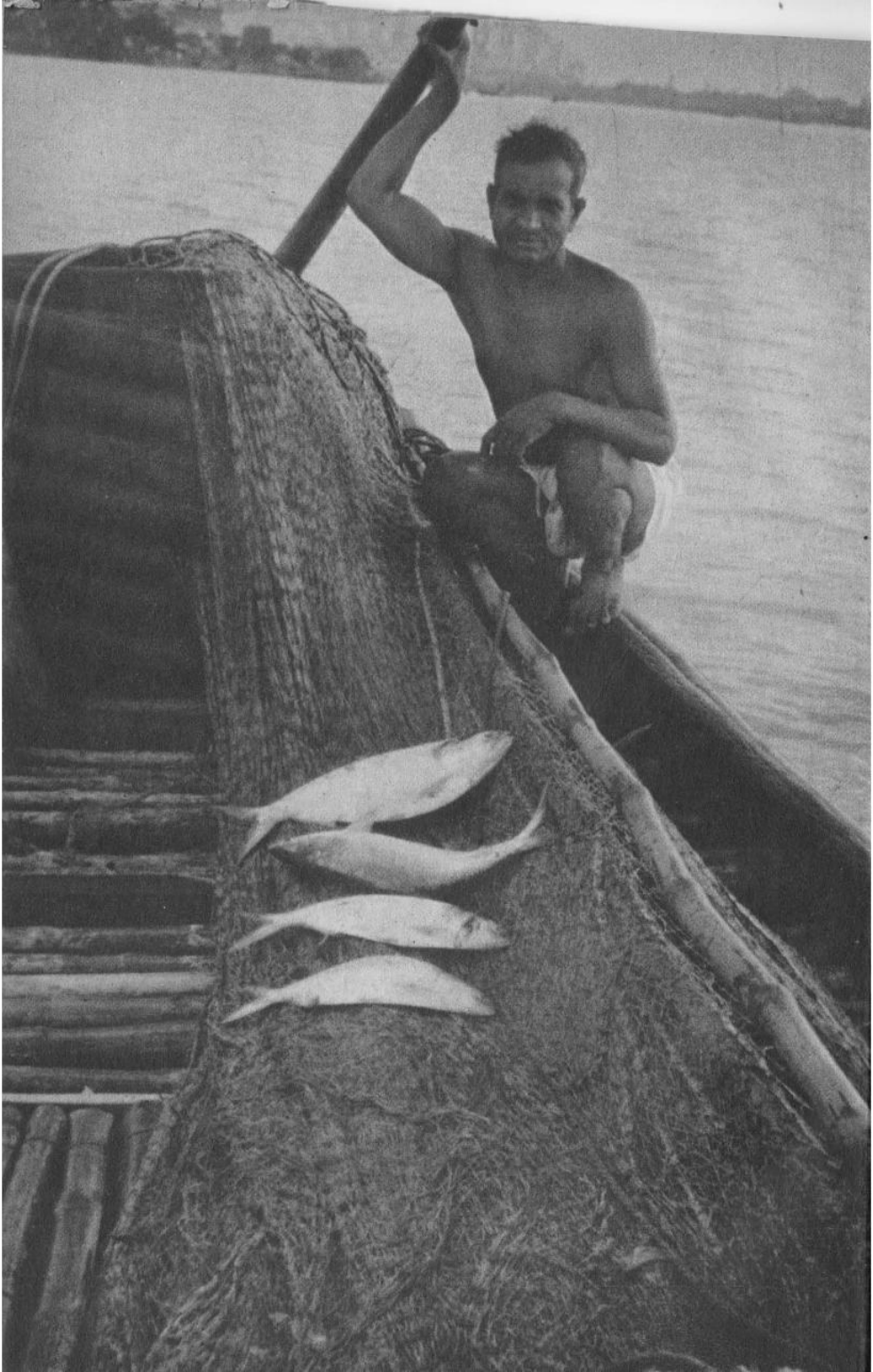

ইলিশ শিকার

বিশ্বরঞ্জন সরকার

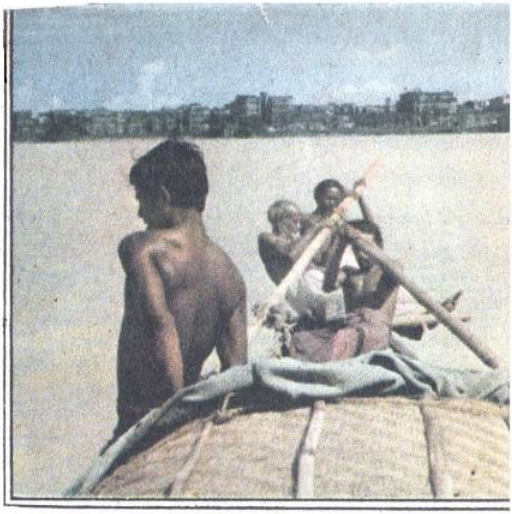

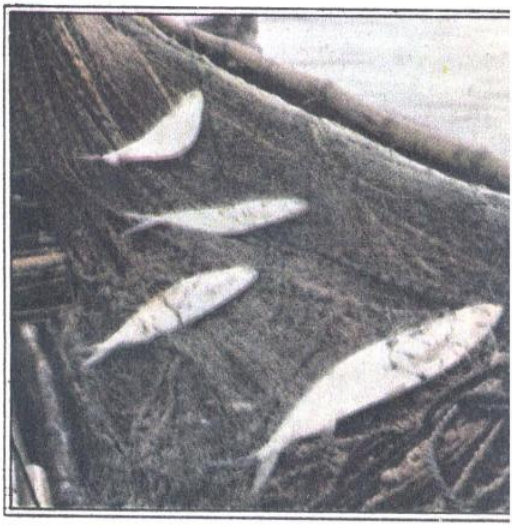

তোমাদের প্রায় সবাই মাছ খাও। অনেকেরই প্রিয় মাছের তালিকায় আছে রুই কিংবা কাত্‌লা। কিন্তু একটু মনে করিয়ে দিলেই তোমরা হয়তো হৈ-হৈ করে উঠে বলবে, "হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঠিক, আমারও প্রিয় মাছ ইলিশ—ইলিশ।"

আমরা মা-ঠাকুরমার মুখে শুনেছি, এক সময় এক টাকায় গোটা-দশেক পাওয়া যেত। প্রচুর মাছ উঠত তখন বাজারে। এত মাছ যে, অন্যান্য মাছের বাজারদরও নেমে যেত হু-হু করে। ওইসব কথা এখন ভাবতে গেলে কেমন লাগে, তাই না?

অনেক বড় নদীতে ইলিশ পাওয়া যায়। তবে, এক-এক জায়গার ইলিশের স্বাদ এক-এক রকম। গঙ্গার ইলিশ আর পদ্মার ইলিশের স্বাদে অনেক তফাত। পদ্মার ইলিশের গায়ে থাকে গোলাপি আভা। গঙ্গার ইলিশ দেখতে একটু সোনালি।

ইলিশ প্রায় সারা বছর ঝাঁক বেঁধে সমুদ্রের ধারে-ধারে সাঁতার কেটে বেড়ায়। ইলিশ ধরার মরসুম আষাঢ় থেকে আশ্বিনের মাঝামাঝি। বৃষ্টি পড়লেই ইলিশের ঝাঁক ডিম ছাড়ার জন্যে সমুদ্র থেকে নদীর মিষ্টি জলে চলে আসে। স্রোতের বিপরীত দিকে সাঁতার কেটে নদীর ওপরের দিকে চলে আসে তারা। সাধারণত জলের চার-পাঁচ ফুট নীচে দিয়ে ইলিশ চলাফেরা করে। তবে স্রোতের বেগ বেড়ে গেলে তারা জলের আরও নীচে নেমে যায়। তারপর নদী-পথে শত-শত কিলোমিটার এগিয়ে যায়। হালকা

স্রোতের বাঁকে স্ত্রী-ইলিশ ডিম ছাড়ে। ডিম ফুটে ইলিশের বাচ্চাগুলো মাসখানেক ওই জায়গাতেই ঘোরাফেরা করে। তারপর একদিন ঢুকে পড়ে সমুদ্রে। পরে আবার ফিরে আসে নদীতে।

এবার শোনো, ইলিশ ধরা হয় কেমন করে। ইলিশ-শিকারে খুব উত্তেজনা আছে। সেই ত্রিবেণী থেকে খিদিরপুর পর্যন্ত বিরাট এলাকায় ইলিশ-শিকার হয়। **তিনশোর** বেশি নৌকো ইলিশ ধরার কাজে নিযুক্ত। যাঁরা ইলিশ শিকার করেন তাঁদের অধিকাংশই বাংলাদেশের নোয়াখালির লোক।

ইলিশ-শিকারে যায় তিন রকমের নৌকো। বড়, মাঝারি আর ছোট। এই নৌকোগুলোর মাপ যথাক্রমে ৪৫ ফুট বাই ৮ ফুট, ৪২ ফুট বাই ৬ ফুট এবং ৩০ ফুট বাই ৫ ফুট।

নৌকোর সাজ-সরঞ্জাম দেখার মতো। বড়-বড় নাইলনের জাল, আড়াআড়ি ফাঁপা বাঁশ, নাইলনের মোটা-মোটা দড়ি। এইসব নিয়ে নৌকোগুলো ইলিশ শিকার করতে যায়। সাজ-সরঞ্জাম এবং নৌকো তৈরির খরচ বিশাল।

সাধারণত প্রতি নৌকোয় থাকে ৬ থেকে ৮ জন ইলিশ-শিকারি। এদের কাউকে মাছ ধরার জন্য অবশ্য কোনো কর দিতে হয় না। কারণ, রানী রাসমণির সময় থেকে কলকাতার গঙ্গা নিষ্কর।

দৈত্যের মতো নৌকোগুলো, কাঠ দিয়ে তৈরি। আর, তাদের ধরে রাখার জন্যে আছে অনেকগুলো **নোঙর**। ওই **নোঙর**গুলো জলে ফেলে স্রোতের হাত থেকে বাঁচে নৌকোগুলো। কমপক্ষে হাজার ফুট দৈর্ঘ্যের জাল ফেলা হয় সমান করে। তিন-চার ফুট দৈর্ঘ্যের ফাঁপা বাঁশ আটকানো থাকে জালে। এই ফাঁপা বাঁশগুলো ভেসে থাকে জলের ওপর। বাঁশ দেখে ইলিশ-শিকারিরা বুঝতে পারে, জাল কত দূর পর্যন্ত ছড়ানো আছে। আর থাকে চল্লিশ-পঞ্চাশটি খালি টিনের বাক্স। বড়-বড় বাক্সগুলো দড়ির সঙ্গে গাঁথা থাকে। এই বাক্সগুলোকে **'ডোল'** বলে। এই ডোলগুলো দূরে-দূরে ভেসে স্রোতের মুখে নৌকোগুলোকে সমান করে রাখে।

নানা রকমের জাল ব্যবহার করা হয় ইলিশ শিকারে। জালগুলোর নামও অদ্ভুত ধরনের। যেমন—টানা, বেড়, কোনা, দাঁড়া, পাতন, চণ্ডী, চাগিলা, হর, সাংলা ইত্যাদি। আড়াআড়ি ভাবে ফেলা হয় নদীতে। ইলিশ খুব সুখী প্রকৃতির মাছ। কোনও এক জায়গায় ধাক্কা খেলেই ব্যাস! অমনি মরণ!

ইলিশের গতি-বিধিও বিচিত্র। সামনের সারির মাছ যেদিকে যায়, পেছনের সারির মাছও সেইদিকে ছোটে। ফলে, সবাই জালে ধরা পড়ে একসঙ্গে।

তোমরা **হয়তো** দেখেছ যে, গঙ্গায় সার-সার নৌকো মাঝমধ্যে চুপ করে ভেসে থাকে এক জায়গায়। আসলে ওরা অপেক্ষা করে জোয়ারের জল কমে আসার জন্য। তারপর শুরু হয় কর্মব্যস্ততা।

কখনও-কখনও কয়েক শো ফুট জাল গুটিয়ে দেখা যায়, একটাও মাছ পড়েনি জালে। আবার উলটোটাও হয়। প্রতি ফুট জালে একটা-দুটো ইলিশ। তখন কী মজা! তাই ইলিশ জল থেকে উঠলেই মরে যায়। কিন্তু, জালে-পড়া রুপোলি ইলিশের ঝাঁকের রূপই আলাদা।

লিখতে হবে

লিখতে হবে পড়াশুনো
লিখতে হবে গান
লিখতে হবে ভাজা মাছটা
উলটে কে-কে খান

মৌমিতা দাস (বয়স ৮)

জেলিফিশ

আমি আমার বাবা, মা আর ঠাকুমার সঙ্গে পুরী বেড়াতে গিয়েছিলাম। একদিন সমুদ্রে স্নান করতে গিয়ে দেখি, পায়ের কাছে নরম-মতো কী যেন একটা! আমি ভয় পেয়ে মাকে জড়িয়ে ধরলাম।

মা বললেন, "ওটা তো জেলিফিশ, ওরা সমুদ্রে থাকে। ওদের দেখে ভয় পাবার কিছু নেই।"

পামেলা চৌধুরী (বয়স ৫)

আদর

একটি ছেলের নাম যদু। একদিন তার মা তাকে বললেন, "তুমি যদি পরীক্ষায় প্রথম হও, তোমাকে একটা জিনিস কিনে দেব।"

যদু প্রথম শ্রেণীতে পড়ে। সামনে পরীক্ষা। সে খুব মন দিয়ে পড়াশুনো করতে লাগল। পরীক্ষায় প্রথম হল যদু। তারপর মাকে বলল, "আমাকে একটা জিনিস কিনে দেবে বলেছিলে, দাও এবার।"

ওর মা তখন হাসতে-হাসতে ওকে একটা পাঁচ টাকার নোট দিয়ে বললেন, "পাঁচ টাকার আদর কিনে নিয়ে এসো তো।"

যদু কোনো দোকানে আদর পেল না। তখন সে শুকনো মুখে ফিরে এসে মায়ের কাছে বলল, "আদর কোথাও পেলাম না মা।"

ওর মা তখন ওকে বুকে টেনে নিয়ে বললেন, "এসো, আমি তোমাকে আদর করছি।"

মায়ের আদর পেয়ে যদুর এত আনন্দ হল যে, ওর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল টপ-টপ করে।

রীতেশ সাধু (বয়স ৮)

পামেলা আর আমি

আমার ক্লাসের ঘনিষ্ঠ বন্ধুর নাম পামেলা। পামেলার সঙ্গে আমার যত ভাব, তত ঝগড়া। একবার ক্লাসের পরীক্ষায় পামেলা আমার থেকে ইংরেজিতে বেশি নম্বর পেল। আমি অঙ্কে পামেলার থেকে বেশি নম্বর পেলাম। পামেলা আমায় বলল, "এই,তুই এত ভাল অঙ্ক করিস কী করে?"

আমি বললাম, "তুই-ই বা ইংরেজি এত ভাল লিখিস কী করে?"

এই সামান্য কথা নিয়ে আমাদের দুজনের মধ্যে কথা কাটাকাটি হল, তারপর আড়ি।

সে-রাতে আমার খুব মন খারাপ হয়ে গেল। পামেলারও হয়েছিল।

পরদিন স্কুলে ও আমার দিকে তাকিয়ে হেসে কথা বলল, আমিও হেসে উত্তর দিলাম। আমাদের মন হালকা হয়ে গেল। তারপর দুজনে ঠিক করলাম, ও আমাকে ইংরেজিতে সাহায্য করবে, আর আমি ওকে অঙ্কে সাহায্য করব।

ঈপ্সিতা দে (বয়স ১১)

টাইগার চোর ধরল

সেদিন গভীর রাতে ঘুম ভাঙল টাইগারের ডাকে। কী যেন দেখে ডাকছে ও। এগিয়ে-পিছিয়ে, পিছনে পা ঘসে-ঘসে ডেকে যাচ্ছে। টাইগার আমাদের পোষা কুকুরের নাম। উঠে দেখি টাইগার একটা চোর ধরেছে।

বাবা উঠে চোরটাকে পুলিশে দিলেন। এই ঘটনার পর থেকে পাড়ায় টাইগারের খুব নাম হয়ে গেল। ওর বয়েস কিন্তু মোটে চার মাস বাইশ দিন।

প্রদীপ্ত দত্ত (বয়স ১০)

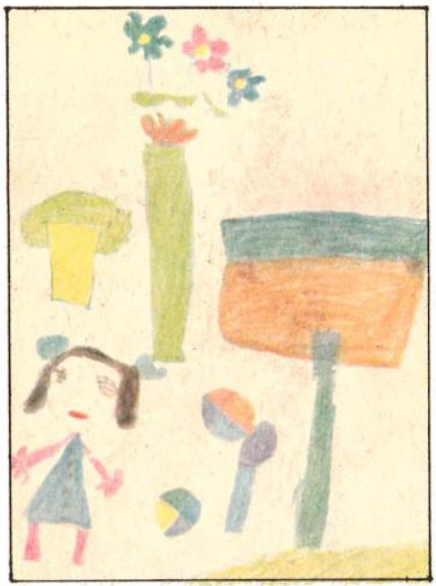

ছবি এঁকেছে মীনাক্ষী দত্ত (বয়স ৬)

চোরকে মারতে দেখে

রাত তখন ঠিক দুটো। আমি মশারির ভেতরে ঘুমোচ্ছি। হঠাৎ কিসের গোলমালে ঘুম ভেঙে গেল।

একটু পরে শুনলাম, চোর এসেছে। আমি চোর দেখতে গেলাম। দেখলাম একটা লোককে সবাই খুব মারছে। ওই লোকটাই চোর। চোরকে মারতে দেখে আমার খুব কষ্ট হল।

দেবাশিস বালা (বয়স ৬)

ছবি এঁকেছে ইন্দ্রনীল ঘোষ (বয়স ১০)

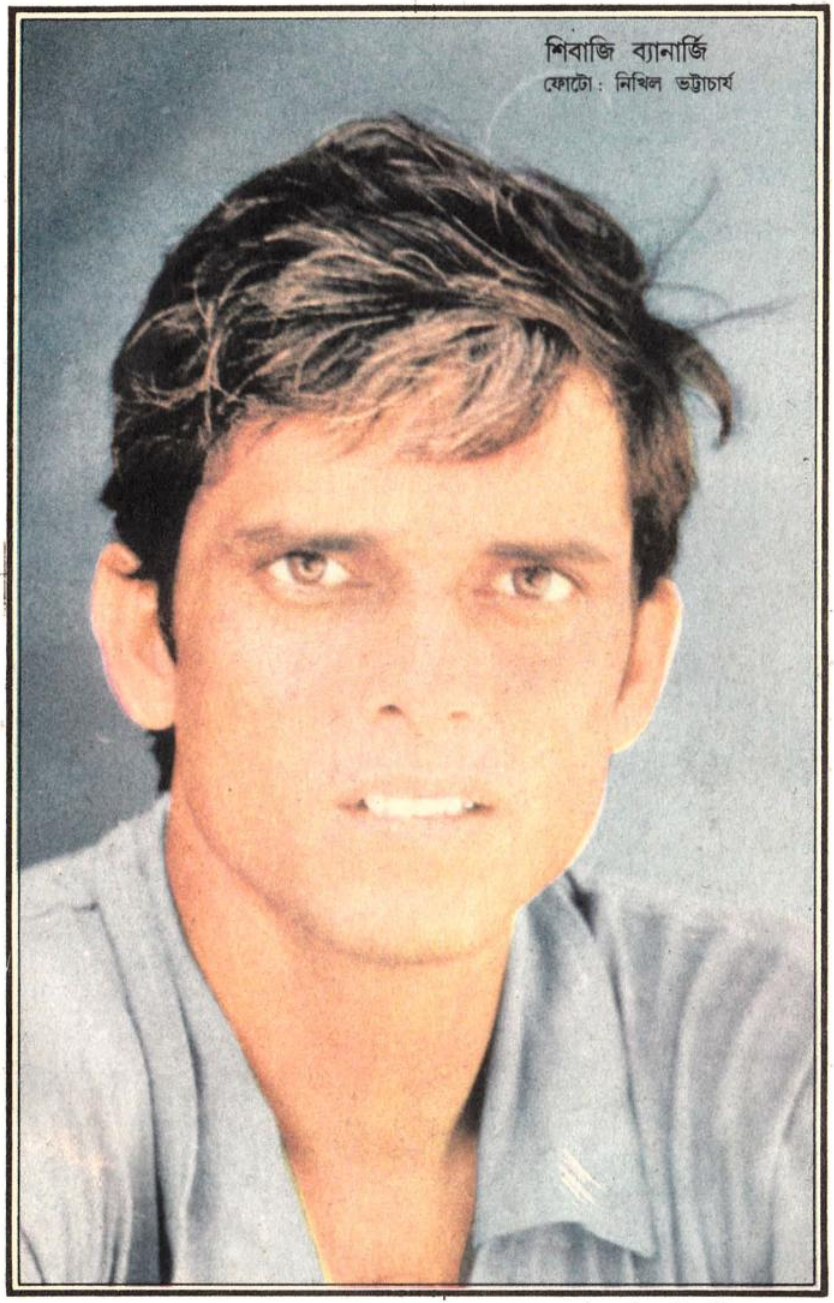
শিবাজি ব্যানার্জি
ফোটো : নিখিল ভট্টাচার্য

প্রজাপতি প্রজাপতি দেখ লক্ষীটি,
আমার বাগান, ফুল আর আমি—তোমার পুরোন বন্ধুটি
প্রজাপতি প্রজাপতি জেম্‌স নাও এসে
তুমি আমি আর সব বন্ধু মিলে খাই ভালবেসে !
Cadbury's
GEMS
পলে পলে জেম্‌স মুখে,
জীবন কাটে মহা সুখে!
ক্যাডবেরিস
চকলেটস্
ক্যাডবেরিস্ জেম্‌স থাকলে ভাই, বন্ধু পাওয়ার ভাবনা নাই।
OBM 6642 BN

পেনালটি রোখার রাজা

অশোক রায়

ইডেনের সব চোখ তখন আকবরের পায়ে। চোয়াল শক্ত করে শিবাজিও স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন পেনালটি স্পটে বসানো বলটার দিকে।

আকবর শট নিলেন। ডান পায়ে চমৎকার ইন-সুইং। কিন্তু পোস্টের পাশ দিয়ে বল গোলে ঢোকার আগেই শিবাজির পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চি দীর্ঘ শরীর শূন্যে ছিটকে উঠল। এবং বাঁ দিকে ঝাঁপিয়ে তিনি বলে হাত ছোঁয়ানো মাত্রই মোহনবাগান - সমর্থকদের যাবতীয় উৎকণ্ঠা মুহূর্তে উল্লাস হয়ে আকাশ কাঁপিয়ে দিল। টাইব্রেকারে অমলরাজ আর আকবরকে রুখে শিবাজি এইভাবেই মোহনবাগানকে একা হাতে তুলে দিয়েছিলেন ১৯৮০-র ফেডারেশান কাপের ফাইনালে। বারের নীচে দাঁড়িয়ে সমর্থকদের বহু উৎকণ্ঠা এবং আশঙ্কাকে এইভাবেই স্বস্তির মধ্যে ফিরিয়ে এনেছেন শিবাজি বহুবার।

ভাস্করকে ভাবনার মধ্যে রেখেও যদি বলা যায় পেনালটি আটকানোর ব্যাপারে শিবাজিই এখন ভারতের এক নম্বর, মনে হয় মতপার্থক্য হবে না। সেই এক নম্বর গোলকীপারের সঙ্গে পেনালটি বাঁচানোর মতো কিছু জরুরি কথা সেরে নেবার আগে চলো বিভিন্ন মাঠে শিবাজির পেনালটি রোখার কিছু ছবি একবার দেখে নেওয়া যাক।

তবে গোড়াতেই বলে নিই, শিবাজি ব্যানার্জি খুব চালাক। এত পেনালটি রুখেছেন কিন্তু পেনালটি বাঁচানোর 'মেড-ইজি'টা তিনি কিছুতেই হাতছাড়া করতে রাজি হলেন না। বোধহয় আরও পেনালটি আটকাতে হবে ভেবেই।

১৯৭৮-এ কালিকটে নাগজি ট্রফির

ঝাঁপিয়ে পড়ে পেনালটি শট আটকাচ্ছেন শিবাজি

সেমি-ফাইনালে প্রিমিয়ার টায়ার্সের পায়াস আর দিনকর পেনালটি মারার সময় বাঁ দিকের ফাঁকা জায়গা দিয়ে কাজ উদ্ধার করতে গিয়েই আটকে গিয়েছিল শিবাজির হাতে। ঐ বছরই ফেডারেশান কাপে আই. টি. আইয়ের বিপক্ষে পেনালটি রোখার পর ডরাণ্ড সেমি-ফাইনালে জে. সি. টির অশোককুমার এবং দর্শনের মতো দুটি কঠিন লোকও পাকড়াও হয়েছিল শিবাজির মুঠোয়।

১৯৮০-র ইডেনে ফেডারেশান কাপে মহঃ স্পোর্টিংয়ের সঙ্গে সেই ম্যারাথন ম্যাচের কথা তো আগেই বলেছি। ঐ বছর ডুরাণ্ডে আবার জে. সি. টির সঙ্গে টাইব্রেকার। বুদ্ধিমান মনজিৎ এবং বলবান পারমারের শটে শোধ নিতে চাইল

সেই পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর অনুভূতির জন্য..

লাইফবয় পার্সোনাল

নতুন লাইফবয় পার্সোনাল সেই চির পুরাতন লাইফবয়ের মতই ধুলোময়লার বীজাণু দূর করে...এর সুপ্রচুর ফেনা ও মনমাতানো সুগন্ধ আপনাকে এনে দেয় একটি পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর অনুভূতি। তেমনি আকর্ষণীয় এর গড়ন ও মোড়ক। লাইফবয় পার্সোনাল দিয়েই স্নান করুন... আধুনিক যুগের আধুনিক সাবান!

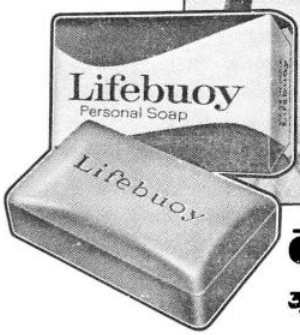

লাইফবয় পার্সোনাল

স্নানে আনে এক অপূর্ব তৃপ্তি

হিন্দুস্থান লিভার-এর একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিন্টাস-LP.10-1812

জে. সি. টি। কিন্তু শিবাজির শেখা বিদ্যে সেবারও থামিয়ে দিয়েছিল ওদের।

এ-বছর নাগজি ট্রফিতে কোয়ার্টার ফাইনালে মফতলাল আর সেমি-ফাইনালে জে. সি. টির বিপক্ষে পেনালটি রোখার সেই ধারা অব্যাহত রেখেছেন শিবাজি। মাত্র কিছুদিন আগে মাদ্রাজে ফেডারেশান কাপে সর্বশেষ পেনালটি মোকাবিলায় শিবাজির প্রতিপক্ষ ছিলেন চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গলের নামী ইরানি স্ট্রাইকার মজিদ বাসকার। ফাঁদ পাতলেন শিবাজি। ডান দিকে একটু বেশি জায়গা ছেড়ে রেখে মজিদকে সেইদিকে মারতে বাধ্য করলেন। শটটি নেবার সঙ্গে সঙ্গেই মোহনবাগান-সমর্থকদের গর্জনে মজিদ বুঝলেন কী ভুল হয়ে গেছে। বল ততক্ষণে শিবাজির ছড়ানো হাতের টোকায় চলে গেছে পোস্টের বাইরে।

এই ফাঁদ পাতার ব্যাপারটা অর্থাৎ ট্যাক্‌টিকস্‌ সম্পর্কে শিবাজি কিন্তু কিছুই ভাঙতে চাইলেন না। একমুখ হাসি ছড়িয়ে শুধু বললেন, "বিশ্বাস করুন, ফাঁদ-টাদ কিচ্ছু নেই।"

পেনালটি মারার ব্যাপারে অন্তত দুটি লোককে শিবাজির দারুণ ভয়। একজন সুব্রত ভট্টাচার্য, যদিও তার বিরুদ্ধে কখনও পরীক্ষা দিতে হয়নি। অন্যজন? পাশে বসা চিন্ময় চ্যাটার্জিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে দিলেন শিবাজি।

কী করে পেনালটি বাঁচে তা কিন্তু শিবাজি নিজেও জানেন না! তবে সুব্রত ভট্টাচার্য, গৌতম সরকার (আগে মানস ভট্টাচার্য) এদের সঙ্গে নিয়মিত প্র্যাকটিসে ওঁর একটা 'আঁচ' করার বিশেষ ক্ষমতা হয়ে গেছে। অবশ্য শিবাজি এখনও বিশ্বাস করেন যে, পেনালটি বাঁচানো যায় না যদি বিপক্ষের খেলোয়াড়টি ভুল না করেন। তবে তাকে ভুলের ফাঁদে ঠেলে দেওয়াটাও গোলকীপারের এক মস্ত কারসাজি।

"কারসাজির কথাটা এক্ষুনি বলে দেওয়াটা কি ঠিক হবে?" আমার শেষ প্রশ্নের জবাবে হাসতে হাসতে বললেন শিবাজি।

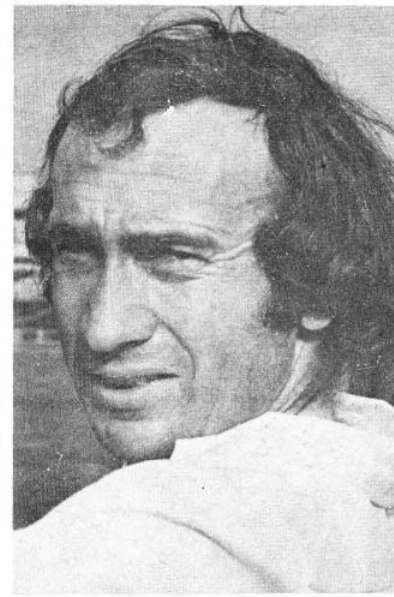

নতুন অধিনায়ক

মণীশ মৌলিক

মাইক ব্রিয়ারলির পর ইংল্যাণ্ড দলের অধিনায়কত্বের গুরুদায়িত্ব বর্তেছিল বথামের ওপর। কিন্তু যখন দেখা গেল এই গুরুভারের চোটে ইয়ান বথাম নামক একজন চৌকশ অলরাউণ্ডারের চমৎকার খেলা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং তার চেয়েও বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ইংল্যাণ্ড দল, তখনই কর্মকর্তাদের মাথায় হাত পড়ল। তাঁরা ভাবতে শুরু করলেন, এরপরে কে অধিনায়ক হবেন? অধিনায়ক হবার যোগ্য প্রার্থী ছিলেন অনেকে। তবু জাতশত্রু অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে বাকি চারটি যুদ্ধে ইংল্যাণ্ডের সম্মান রক্ষা করার জন্য সেই লম্বাটে মুখ, বুদ্ধিদীপ্ত চোখ এবং একমাথা কাঁচাপাকা চুলওয়ালা অধ্যাপক ভদ্রলোককেই ফের ডেকে পাঠানো হল। দেশের স্বার্থে প্রায় একবাক্যে

চুলের যত্নে আমি কোন ঝুঁকি নিতে পারি না পুরোপুরি নির্ভর করি বেঙ্গল কেমিক্যালের ক্যান্থারাইডিনের উপর

ভারতে এই তেলের বিক্রি সর্বাধিক

৬০ বছরের বেশি সময় ধরে একান্ত বিশ্বস্ত

গত ৬০ বছরের বেশি সময় ধরে যাঁরাই চুলের ব্যাপারে একটু যত্নশীল, তাঁরা প্রত্যেকেই ক্যান্থারাইডিন ব্যবহার করেছেন। তাদের এই বিশ্বাসই আমাকে এতো আস্থা যুগিয়েছে। চুলের ব্যাপারে আমি যেমনটি চাই, ক্যান্থারাইডিন আমাকে ঠিক সেভলিই যোগান দেয়—এতে চুলের বাড়-বৃদ্ধি হয় দেখার মতো, চন্দনের মিষ্টি সুবাস থাকায় সারাদিন মনটা সতেজ থাকে এবং চুল এতটুকু চটচটে না হয়েও জেল্লা দেয় অনেক বেশি। চুলের পরিচর্যায় এর চেয়ে বেশি আর কি চাইতে পারি বলুন। আমি তো দেশের সবার পছন্দসই তেলটিই বেছে নিয়েছি।

বেঙ্গল কেমিক্যালের
ক্যান্থারাইডিন
তেয়ার অয়েল

অনবদ্য এই কেশতেলের প্রস্তুতকারক

বেঙ্গল কেমিক্যাল

(ভারত সরকারের একটি উদ্যোগ)

দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তাবে ব্রিয়ারলি রাজি হয়ে গেলেন। যেহেতু ব্রিয়ারলির ওপর নির্বাচকদের আস্থা প্রচুর, অতএব সবাই মনে মনে ভাবতে লাগল, মাইক যদি ফের অধিনায়কত্ব করতে এসে ইংল্যাণ্ডকে জিতিয়ে দিতে পারেন, তবে নিঃসন্দেহে, আগামী ভারত ও শ্রীলঙ্কা সফরে তিনিই ইংল্যাণ্ড-দলনেতা নির্বাচিত হবেন। নির্বাচকেরাও সম্ভবত এই রকমেরই একটা ছক তৈরি করে রেখেছিলেন। কিন্তু গোড়াতেই ব্রিয়ারলি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন, প্রয়োজনে তিনি আবার অধিনায়কত্ব নিয়েছেন বটে, তবে তাঁর পক্ষে আর কোনো সফরে যাওয়া সম্ভব নয়।

নির্বাচকেরা গভীর চিন্তায় পড়লেন। তাহলে? বথামের পুরনো ছবিটা মুহূর্তমাত্রও তাদের কাছে আর প্রশ্রয় পেল না। না, কখনো নয়। ন্যাড়া কবার বেলতলায় যায়? তবে কাণ্ডারী হবেন কে? ব্রিয়ারলির নেতৃত্বে ইংল্যাণ্ড অভূতপূর্বভাবে এই সিরিজে অস্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করার পর বিশ্বসুদ্ধ লোক যখন এই প্রশ্নের সমাধান খুঁজছে, এবং নানারকম জল্পনা-কল্পনা করছে, তখন নির্বাচকরা ইংল্যাণ্ডের নেতৃপদে অভিষিক্ত করলেন সাঁইত্রিশ বছর বয়সী এসেক্স-তারকা কীথ ফ্লেচারকে। মনোনয়নটা বিশ্বের বহু ক্রিকেটরসিককেই একটু বিস্মিত করেছে। কারণ নেতৃপদের জন্য জোরালো দাবি নিয়ে অপেক্ষা করে ছিলেন ইংল্যাণ্ডের দু-তিনজন খেলোয়াড়। এদের মধ্যে মুখ্য দাবিদার ছিলেন বব উইলিস। জিওফ্রে বয়কট বা ফিল এডমণ্ডসের সম্ভাবনা উজ্জ্বল, এমন ধারণাও অনেকেরই ছিল। সেই তুলনায় ফ্লেচারের অধিনায়ক-পদলাভের সম্ভাবনা তেমন একটা তীব্র কিছু ছিল না। তবে হ্যাঁ, এসেক্স-অধিনায়ক স্বল্পকেশ এই ভদ্রলোককে ঘিরে একটা মৃদু গুঞ্জন উঠেছিল বটে। শেষ পর্যন্ত গুঞ্জনটাই সত্যি হয়ে গেল।

প্রায় চার বছর বাদে কীথ ফ্লেচার আবার টেস্ট ক্রিকেটের জগতে ফিরে আসছেন, একেবারে অধিনায়ক হয়ে। ১৯৭৭ সালে তিনি শেষ টেস্ট খেলেছিলেন। তারপরে ইংল্যাণ্ড দল থেকে তাঁকে বাদ দেওয়া হয়। এ-বছর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খেলা অবধি ফ্লেচার আর টেস্ট দলে ঠাঁই পাননি।

১৯৬৮ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে চতুর্থ টেস্ট ম্যাচে ফ্লেচার প্রথম ইংল্যাণ্ড দলে জায়গা পেয়েছিলেন। ১৯৭৭ সালে টেস্ট খেলার সুবাদে এ-পর্যন্ত তিনি বাহান্নটি টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন। বাহান্নটি টেস্টে তাঁর মোট সংগ্রহ—দু হাজার নশো পঁচাত্তর রান। সেঞ্চুরি করেছেন সাতবার। তার মধ্যে একটি ডাবল সেঞ্চুরিও আছে। ১৯৭৪-৭৫ সালে অকল্যাণ্ডের এডেন পার্কে নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে চারশো তেতাল্লিশ মিনিটে তিরিশটি বাউণ্ডারি সহযোগে সংগৃহীত ২১৬ রানই এখনও অবধি তাঁর সর্বোচ্চ স্কোর। ষোলোটি অর্ধশতরানের অধিকারী এই ব্যাটসম্যান একজন চমৎকার স্লিপ-ফীলডার হিসাবেও যথেষ্ট সমাদৃত। দুবার ফ্লেচার ভারতের মাটিতে টেস্ট খেলে গেছেন। প্রথমবার এসেছিলেন ১৯৭২ সালে, টনি লুইসের দলের সঙ্গে। তারপর ১৯৭৭ সালে টনি গ্রেগের নেতৃত্বাধীনে দ্বিতীয়বার ফ্লেচার ভারতে খেলে গেছেন। বাহাত্তর সালে কলকাতায় তাঁকে আমরা খেলতে দেখেছি। কিন্তু সাতাত্তরে, ইডেনে, তিনি খেলেননি।

আবার তিনি আসছেন। শরীর নিতান্ত অসুস্থ না থাকলে, ইডেনে তিনি তো খেলবেনই। বাহাত্তরে তোমরা যারা তাঁকে দেখোনি, তাদের নিশ্চয় আক্ষেপ রয়ে গেছে। আর কিছুদিন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করো। ইডেনে শীতের এক সুন্দর সকালে তোমরা ইংল্যাণ্ডের নতুন অধিনায়ককে দেখতে পাবে।

জর্জ বার্নার্ড শ ছিলেন অসাধারণ পরিশ্রমী। এই পরিশ্রম করার ক্ষমতা তিনি অতি অল্প বয়েসেই আয়ত্ত করেছিলেন। বার্নার্ড শ লিখেছেন, "যখন আমার বয়েস কম ছিল, আমি লক্ষ করেছিলাম যে, দশটা কাজ করলে তার মধ্যে নয়টায় আমি ব্যর্থ হই। আমি ব্যর্থতাকে মেনে নিতে চাইনি। তাই আরো দশ গুণ পরিশ্রম করে ব্যর্থতাকে পুষিয়ে নিতাম।"

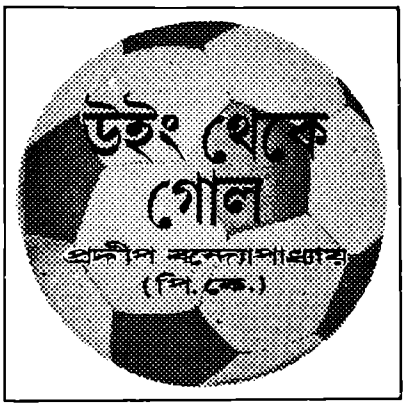

॥ ৩১ ॥

টোকিও এশিয়ান গেমসের সময় বিশ্ববিখ্যাত নিকো কেব্‌ল্ কোম্পানির আমন্ত্রণে ওদের চমৎকার 'গ্রামে' গেলাম। সুদৃশ্য সব কাঠের বাড়ি। হালকা শীত। সর্বত্র আধুনিকতার স্পষ্ট ছাপ। বলাই বাহুল্য, এ 'গ্রাম' আমাদের চেনাজানা 'গ্রাম' নয়! চতুর্দিকে রঙের খেলা, যেন তুলি দিয়ে আঁকা।

বিকেলে নিকো কেব্‌ল্ কোম্পানির ফুটবল টীমের সঙ্গে খেলা। দুপুরে খাওয়ার সময় একটা অভিনব ব্যবস্থা আমাদের বড়ই অস্বস্তিতে ফেলল। এক-একজন সুন্দরী তরুণী আমাদের এক-একজনকে কাঠি দিয়ে খাইয়ে দিচ্ছিলেন। মহামূল্যবান মাদুরের ওপর বসে করুণ মুখ নিয়ে আমাদের খাওয়া সারতে হল। একটা খাবারের নাম এখনও মনে আছে—'সুকিয়াকি'।

বিকেলে ফুটবল-মাঠে অবশ্য আমাদের মোটেই অস্বস্তিতে পড়তে হয় নি। পরিষ্কার নয় গোলে জিতলাম; তার মধ্যে চারটি গোল আমার দেওয়া। বুঝতেই পারছ, নিকো কোম্পানির ফুটবল দলটি খুবই দুর্বল ছিল।

কোম্পানির বাগানটি সত্যিই দেখার মতো। পুকুরে ঝাঁকে ঝাঁকে সোনালি মাছ। দারুণ অ্যাকোয়ারিয়ামও রয়েছে।

বাগানে ঘোরার সময় একজন ছোটখাটো চেহারার ছিমছাম জাপানি ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "ভারতের কোথায় তোমার বাড়ি?" বললাম, "বাড়ি আমাদের জামশেদপুরে—যেখানে টাটার বিখ্যাত স্টীল প্ল্যান্ট।" কথায় কথায় আরো বললাম, "জানেন, আমি ষোলো বছর বয়সে ইণ্ডিয়ান কেব্‌ল্ কোম্পানিতে ঢুকেছিলাম। তখন থেকেই নিকো কেব্‌ল্ কোম্পানির নাম শুনেছি। এখানে এসে নিজের চোখে সব দেখে আমার এত ভাল লাগছে।"

ভদ্রলোক খুব উৎসাহ নিয়ে আমার কথা শুনছিলেন। এমন একজন মনোযোগী জাপানি শ্রোতা পাবার আশা করি নি। পেয়ে গিয়ে, আমি একটানা অনেক কথা বললাম। বয়স্ক ভদ্রলোককে বোঝানোর চেষ্টা করলাম, 'কেব্‌ল্' কাকে বলে, 'ইনসুলেটেড কেব্‌ল্' বলতে কী বোঝায়।

একবার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় চুনী গোস্বামীর মন্তব্য: "ভাল পার্টি পেয়েছিস, চালিয়ে যা, যা খুশি বুঝিয়ে যা!"

ভদ্রলোক মাঝে-মাঝেই বলছিলেন, "ভেরি গুড, ভেরি গুড।" কিছুক্ষণ পর চুনীর মন্তব্য: "বেশি জ্ঞান দিস না, এবার ছেড়ে দে!" তখন আমি 'অ্যালুমিনিয়াম ওয়্যার' সম্পর্কে বলছিলাম। চুনীর কথায় মেজাজটা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় ভদ্রলোকের কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

রাত্রে নিকো কোম্পানির ডিনার। সেখানে ঐ ভদ্রলোককে দেখলাম। ঢুকেই একটা সোফায় বসলেন। কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার বক্তৃতা দিতে উঠে বললেন: "ভারতীয় ফুটবলারদের খেলা আমাদের আনন্দ দিয়েছে, অনেক কিছু শিখিয়েওছে আশা করি। খুবই আনন্দের কথা, ভারতীয় দলের খেলা দেখার এবং এই ভোজসভায় হাজির থাকার জন্য নিকো কেব্‌ল্ কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর স্বয়ং সানফ্রানসিসকো থেকে সরাসরি এখানে এসেছেন। ভারতীয় ফুটবলারদের খেলা দেখে তিনি খুব খুশি। তাঁকে অনুরোধ করছি, এই ভোজসভায় কিছু বলার জন্য।"

আমাকে হতবাক করে বক্তৃতা দেবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন বাগানের ঐ জাপানি ভদ্রলোক! ভেবে দ্যাখো, দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ 'কেব্‌ল্'-বিশেষজ্ঞকে আমি জ্ঞান দিচ্ছিলাম 'কেব্‌ল্' সম্পর্কেই!

তিনি বললেন, "আমার ভারতীয় বন্ধু ব্যানার্জি চমৎকার ফুটবল খেলে। দারুণ সব গোল করে। কিন্তু উপস্থিত সকলে জানেন না, আমার তরুণ বন্ধুটি 'কেব্‌ল্' সম্পর্কেও অনেক

কিছু জানে। তাই, আজ বিকেলে বাগানে ব্যানার্জির সঙ্গে কথা বলে আমি দারুণ আনন্দ পেয়েছি।" তারপর ভারতীয় দলকে অভিনন্দন জানিয়ে আরো কিছু কথা তিনি বললেন। তবে সে-সব শোনার মতো মনের অবস্থা আমার ছিল না। ভাবছিলাম—ধরণী, দ্বিধা হও।

ছোটবেলার একটা ঘটনা মনে পড়ল। আমি তখন খুবই ছোট। একদিন দুপুরে বাবা বন্ধুদের সঙ্গে তাস খেলছিলেন। বাবা চুরুট খেতেন। বন্ধুরাও চুরুট নিচ্ছেন। আমিও বলে ফেললাম, "আমাকে একটা চুরুট দাও।" শুধু বললাম না, হাত বাড়িয়ে নিতেও গেলাম। অতঃপর যে প্রচণ্ড চড়টি আমার গালে পড়েছিল, তার কথা ভাবলে এখনও মাথা ঘোরে। সেদিন সুদূর জাপানেও এই রকম একটি প্রচণ্ড চড়ই যেন আমার গালে পড়েছিল।

জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে কলকাতায় ফিরে এলাম। দু'বছর আগে মেলবোর্নে অলিম্পিকে আমরা চতুর্থ স্থান পেয়েছিলাম, সুতরাং এশিয়ান গেমসে চতুর্থ স্থান পেয়ে আমাদের মনটা খারাপই ছিল। তবে, ছয় দিনে পাঁচটি ম্যাচ না খেলতে হলে হয়তো ফল আর একটু ভাল হত।

উনিশশো আটান্নর লীগে ততদিনে ইস্টার্ন রেলওয়ের ছ'টা ম্যাচে সাত পয়েন্ট হয়েছে। সপ্তম ম্যাচ উয়াড়ির সঙ্গে। বরাবর একটা জিনিস লক্ষ করেছি, আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলে আসার ঠিক পরেই ক্লাব-ম্যাচগুলোকে খুব সহজ মনে হয়। উন্নত মানের ফুটবলারদের বিরুদ্ধে খেলে আসার পর ক্লাব-ম্যাচে মনে হয়, যা খুশি তা-ই করা সম্ভব!

উয়াড়ির সঙ্গে খেলার দিন বেশ ঝোড়ো হাওয়া ছিল। প্রথম কয়েক মিনিট একটু এলোমেলো খেলা হল। তারপর ডান দিকে বল ধরে প্রচণ্ড বেগে এগিয়ে একটা গোল করলাম। মিনিট পনেরোর মধ্যেই আরো দুটো গোল করে হ্যাটট্রিক পেয়ে গেলাম। একটি গোল—প্রায় চল্লিশ গজ দূর থেকে নেওয়া শটে।

এই ম্যাচের পর থেকে আমাদের টীমের খেলায় প্রচুর উন্নতি দেখা গেল। বাঘাদা তো ছিলেনই, সতীশ মিত্র আর নিলু মিত্রের মতো উৎসাহী অফিসাররা টীমের জন্য দিনরাত চিন্তা করতেন। আর কে কে দাস ছিলেন সব-কিছু ঠিকভাবে চালিয়ে নেওয়ার জন্য। প্রদ্যোৎ

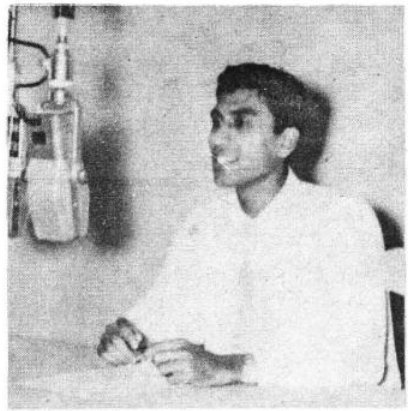

প্রদীপ (১৯৫৮)

বর্মণ, অসীম সোম, সুনীল নন্দী, প্রশান্ত সিংহ, অমল সেনগুপ্ত, সুধীর রায়, তাপস বসু—এইসব উঠতি বাঙালি ফুটবলারদের নাম বাংলা দেশে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। আগের বছর দুর্দান্ত খেলে আমরা আই. এফ. এ. শীল্ড ফাইনালে উঠেছিলাম। এবারের টীমও বড় কিছু করবে, এমন আশা সত্যিই জাগল।

মহমেডান স্পোর্টিংয়ের বিরুদ্ধে প্রথম খেলায় আমাদের টীম ছিল এই রকম: প্রদ্যোৎ বর্মণ, চুনো ঘোষ, পি (বুড়ন) বসু ও ভূপতি মিত্র; অমল সেনগুপ্ত ও নিখিল নন্দী; পি কে ব্যানার্জি, সুনীল নন্দী, অসীম সোম, প্রশান্ত সিংহ এবং দিনু দাস। তাপস সোম এই ম্যাচে খেলেন নি।

মুস্তাক আমেদ, সালাম, আবিদ, মহম্মদ আলি, রহমতুল্লা, ওমর এবং মুসার মতো দুর্ধর্ষ সব খেলোয়াড় টীমে থাকা সত্ত্বেও মহমেডান হেরে গেল। তিন ব্যাক প্রথায় নিখুঁত ফুটবল খেলল ইস্টার্ন রেল। দারুণ খেললেন বুড়ন বসু আর নিখিল নন্দী। নিখিল নন্দীর পাস থেকেই গোল করে টীমকে এগিয়ে দিয়েছিলাম আমি। কিন্তু চমৎকার হেড করে গোল শোধ করে দিলেন ওমর। কিন্তু এক মিনিটের মধ্যেই আমরা আবার গোল করলাম। আমার কাছ থেকে বল পেয়েই অসীম সোম ঠেলে দিয়েছিলেন দিনু দাসের দিকে। সুযোগসন্ধানী দিনু গোলে বল পাঠাতে ভুল করেন নি। ভিজে মাঠে এই উপভোগ্য খেলা দর্শকদের মুগ্ধ করল।

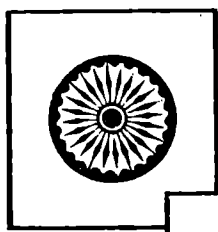

ভারত ও জার্মানী

এক পারস্পরিক সহযোগিতা-নির্ভর সম্পর্ক

ভারত ও জার্মানীর মধ্যে পারস্পরিক মৈত্রীর সম্পক একদিনে গড়ে ওঠেনি। এমন কি এই মৈত্রী শুধুই স্বার্থ-নির্ভরও নয়।
এই মৈত্রীর শিকড় দুই মহান দেশ ও সভ্যতার ঐতিহ্যজাত মূল্যবোধের গভীরে। যে মূল্যবোধের প্রতিভূ রবীন্দ্রনাথ এবং মহাত্মা গান্ধী, গ্যেটে এবং ম্যাক্সমূলার। একই আদর্শ ও উদ্দেশ্যের রূপায়নের চেষ্টায় গত কয়েক দশক ধরে গড়ে উঠেছে এই মৈত্রীর বন্ধন।

সেই আদর্শ, যা শান্তি, মানবিকতা ও সামাজিক ন্যায়ের মাধ্যমে দূরত্ব দূর করে দুটি আলাদা জগৎকে নিয়ে আসে পরস্পরের নিকটে—যা ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও যুদ্ধের অভিশাপ দূর করতে বদ্ধপরিকর। যাতে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সৃষ্টি হয় উন্নততর ভবিষ্যৎ, ধরা দেয় সমৃদ্ধি ও প্রগতি। সেই লক্ষ্য, যা দুটি দেশের চিন্তাতেই বিশিষ্ট।

বর্তমানে ভারতের উন্নয়নশীল অর্থনৈতিক ও অন্যান্য কার্যসূচীর বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্রে, যেমন শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি ও শিক্ষা—আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা করেছেন ফেডারেল প্রজাতন্ত্রী জার্মানী।

পরিবর্তে তাঁরা যা পাচ্ছেন তার মূল্যেরও পরিমাপ হয় না কোনো। এই প্রাপ্তির তালিকায় প্রথমটিই হলো ভারত নামে ষাট কোটিরও বেশী মানুষের শুভেচ্ছা ও বন্ধুত্ব।

ফেডারেল প্রজাতন্ত্রী জার্মানী—এক বিশ্বস্ত সহযোগী

আমাদের অধিনায়ক বুড়ন বসুর মতো ঠাণ্ডা মাথার ডিফেণ্ডার খুব কমই দেখেছি। চন্দন সিং এবং সুভাষ সর্বাধিকারী থাকায় সর্বভারতীয় স্তরে খুব বেশি ওঠার সুযোগ পান নি। বর্ষার মাঠেও খালি পায়ে কী ফুটবল যে খেলতেন, না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। তাঁর খেলার বিশেষত্ব ছিল প্রখর অনুমানশক্তি, ভাল হেডওয়ার্ক এবং নির্ভুল পাস দেওয়া। কলকাতা মাঠে তিনিই প্রথম 'স্টপার'।

কে কে দাস আর বাঘাদা উনিশশো আটান্নয় একটি নতুন জিনিস চালু করলেন। আমরা মাঠে ঢুকেই সেণ্টার সার্কেলে বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে দর্শকদের নমস্কার করতাম। সম্ভবত এজন্যই বিপক্ষ বড় দলের সমর্থকরাও আমাদের সব সময় অপছন্দ করতেন না!

পরের বড় ম্যাচ ঠিক এক সপ্তাহ পরে, মোহনবাগানের বিরুদ্ধে। খেলা শুরুর এক মিনিট পরেই আমরা এগিয়ে গেলাম। নরসিয়া এবং মান্নাদাকে কাটিয়ে প্রায় গোললাইনে পৌঁছে ছোট্ট ব্যাকসেণ্টার করলাম। বুদ্ধিমান ফরোয়ার্ড নাটকি (অসীম সোম) পা তুলে বল ছেড়ে দিলেন, কারণ পাশেই একেবারে ফাঁকা অবস্থায় ছিলেন উদীয়মান প্রশান্ত সিংহ। প্রশান্তর তীব্র শট মোহনবাগানের গোলরক্ষক ফিশেদাকে (এস চ্যাটার্জি) দাঁড় করিয়ে রেখে গোলে ঢুকল।

কিন্তু, খেলা শেষ হওয়ার মাত্র দুই মিনিট আগে গোল শোধ করে দিল মোহনবাগান। সমর (বদ্রু) ব্যানার্জি গোলের সামনে বল তুললেন, প্রদ্যোৎ বর্মণ 'ফ্লাইট' বুঝতে না পারায় গোল করে গেলেন নিশীথ বিশ্বাস। নদিয়া জেলার এই ফুটবলারটির পায়েও চমকপ্রদ কাজ ছিল।

খেলার শেষ বাঁশি বাজার কয়েক সেকেণ্ড আগে চুনী গোস্বামী পাঁচ গজ দূর থেকে বাইরে শট না করলে এই ম্যাচে আমরা হেরেই যেতাম। (ক্রমশ)

পুপুর ফানুস

শিবময় দাশগুপ্ত

পুপু ফানুস উড়িয়ে দিল
হাওয়ার স্রোতে ঘুরিয়ে দিল—
উড়ছে ফানুস, আগুন বুকে,
দেখছে পুপু অবাক সুখে,
বলছে পুপু, "যা তুই চলে,
জম্বুদ্বীপে বা সিংহলে,
সিকিম, ভুটান, নেপাল কাছে—
জাপান খানিক দূরে আছে।
চীন বেড়িয়ে আসতে পারিস,
শূন্যে উঠে রুমাল নাড়িস,
আফ্রিকা যাস, যাস রাশিয়া,
সেখান থেকে টাসমানিয়া;
এস্কিমোদের বরফ-দেশে,
জার্মানি, ফ্রান্স, অবশেষে—
আমেরিকায় দাদা থাকে,
কুশল-খবর দিবি তাকে।
লম্বা ভ্রমণ সাঙ্গ হলে
এই ছাদে ফের আসবি চলে;
থাকব আমি দাঁড়িয়ে ঠায়
গল্প শোনার অপেক্ষায়।

ছবি সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

"নিখুঁত পরিষ্কার"

"হুইল যে কি জিনিষ, আমার বৌমাটি তো তা জানতোই না। এইসব নতুনের দলেদের কি আর বলব, এখনও সেই পুরোনপন্থী হয়েই রয়েছে! হুইল-এ যে কত সাশ্রয় হয় তা ওকে বোঝালাম—আর এও বললাম যে, প্রতিটি বার-এ চারটি ক'রে ভাগ থাকে। আর তারপর ও এই বিপুল ফেনার রাশি আর কাপড়ের সমস্ত ময়লা ধুয়ে বেরিয়ে যেতে দেখে তো একেবারে অবাক! হুইল-এ কাপড় কাচলে কাপড় পরিষ্কারও হয় সাবানের চেয়ে বেশী আর কাপড় ধোয়াও যায় অনেক বেশী! তাই তো এখন হুইল-এর ওপর ওর দারুণ বিশ্বাস জন্মে গেছে—সাবানের আর দরকারটাই বা কি বলুন তো?"

হুইল

দারুণ ধোলাই শক্তি - চড়া দাম থেকে মুক্তি!

হিন্দুস্থান লিভার-এর একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিনটাস-WL.12-1810 BG

আগে যা ঘটেছে: শিশিরের অদ্ভুত অসুখ। চোখের সামনে নানা আজগুবি ব্যাপার ঘটে। অচেনা লোক বলে, কাছে যা আছে, তা না-রাখাই ভাল। সেটা কি এই পুরনো আঙটি? বাবুদা তাকে কৃষ্ণদয়ালের কাছে নিয়ে যায়। তিনি নানা অভিশপ্ত বস্তুর কথা শোনেন। ভুয়ো টেলিগ্রামে পিসিমার অসুখের খবর পেয়ে শিশির হাজারিবাগে আসে। সেখানে আক্রান্ত হয়েও বেঁচে যায়। আলাপ হয় সিংহিবাবুর সঙ্গে। তিনি বলেন, "আমি তোমার শত্রু নই।" প্রয়াগ নামে যে-লোকটি শিশিরদের বাড়িতে কাজ করত, সে কি ওষুধ মেশাত তার খাবারে? ভবতোষ সান্যালের বাড়িতে টেলিগ্রামের ফর্ম থাকে কেন? সান্যালের বাসে উঠেছিলেন সিংহিবাবু। বাস-দুর্ঘটনায় তিনি আহত। তাঁকে কি মেরে ফেলবার চেষ্টা হয়েছিল? তারপর...

॥ ২৪ ॥

শিশির আর বাবু বোকার মতন বসে থাকল। বুঝতে পারছিল না, সিংহিবাবু কী এমন কথা শোনাবেন। কৌতূহল হচ্ছিল, আবার কেমন ভয়-ভয় করছিল।

ততক্ষণে চারদিক অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। রাস্তা দিয়ে একটা গোরুর গাড়ি যাচ্ছিল। অন্ধকারেই। চাকার শব্দ হচ্ছিল বিশ্রী। দুটো খেঁকি কুকুর কোথাও ঝগড়া করছে।

সিংহিবাবু বললেন, "বাতি দিতে বলি। বোসো।" বলেই তিনি উঠলেন।

সিংহিবাবু চলে যেতেই শিশির গলা নামিয়ে বলল, "বাবুদা, কী মনে হচ্ছে তোমার?"

বাবু বলল, "আমার তো ভালই মনে হচ্ছে।"

"ভাল?"

"সিংহিবাবু ভবতোষের ওপর হাড়ে-হাড়ে চটেছেন। শুধু চটেছেন কেন বলব, ভবতোষকে তিনি তাঁর শত্রু মনে করছেন। যে-মানুষ সিংহিবাবুকে প্রাণে মারতে চেয়েছিল, তাঁকে তিনি নিশ্চয় বন্ধু বলে আর মনে করবেন না। আমাদের তো ভালই হল।"

শিশির বলল, "আমারও মনে হচ্ছে, সিংহিবাবু মনে-মনে কিছু ভেবেছেন। তেমন যদি হয় বাবুদা, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলব। কিন্তু আমি ভাবছি, উনি আমাদের কথা এত জানলেন কেমন করে? কী যে বলবেন তাও বুঝতে পারছি না।"

সিংহিবাবু ফিরে এলেন। হাতে লণ্ঠন। এ-বাড়িতেও ইলেকট্রিক নেই।

লণ্ঠনটা বারান্দার একপাশে রেখে দিয়ে বসলেন সিংহিবাবু। মিটমিটে আলোয় অস্পষ্ট করে তাঁর মুখ দেখা যাচ্ছিল। গম্ভীর মুখ। কেমন এক ক্ষোভও রয়েছে।

সামান্য অপেক্ষা করে সিংহিবাবু বললেন, "তুমি কোনোদিন ভবতোষবাবুকে দেখোনি বললে, শিশির। সেটা হতে পারে। কিন্তু এবার তোমাকে আমি ক'টা কথা বলি। মন দিয়ে শোনো। তোমার ঠাকুরদা নিশিকান্ত...কী, নামটা ঠিক বলেছি?"

শিশির যেন আকাশ থেকে পড়ল। ভদ্রলোক তার ঠাকুরদারও নাম জানেন? আশ্চর্য! খুবই অদ্ভুত ব্যাপার। শিশির বলল, "হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। আপনি কেমন করে জানলেন?"

সিংহিবাবুর মুখে বোধহয় পাতলা হাসি খেলে গেল। "কেমন করে জানলাম, সে-সব প্রশ্ন পরে। আগে আমি যা বলছি তার সঙ্গে তোমার পরিবারের কথা মিলিয়ে নাও। ভুল হলে বোলো।"

বাধ্য ছেলের মতন মাথা নাড়ল শিশির।

"নিশিকান্তবাবু, মানে তোমার ঠাকুরদা ছিলেন ব্যবসায়ী। তাঁর ব্যবসা ছিল আইনের বইয়ের। দোকান ছিল ধর্মতলা স্ট্রীটে। লালগোলার লোক। কলকাতায় এসে মামাতো এক দাদার সঙ্গে ওই বইয়ের ব্যবসাপত্র শুরু করেন। ব্যবসাটা বেশিদিন চলে নি। দাদার সঙ্গে অশান্তি শুরু হয়। তখন নিশিকান্তবাবু, তোমার ঠাকুরদা, নিজের চেষ্টায়, ধারকর্জ করে নিজের এক দোকান দেন ল'

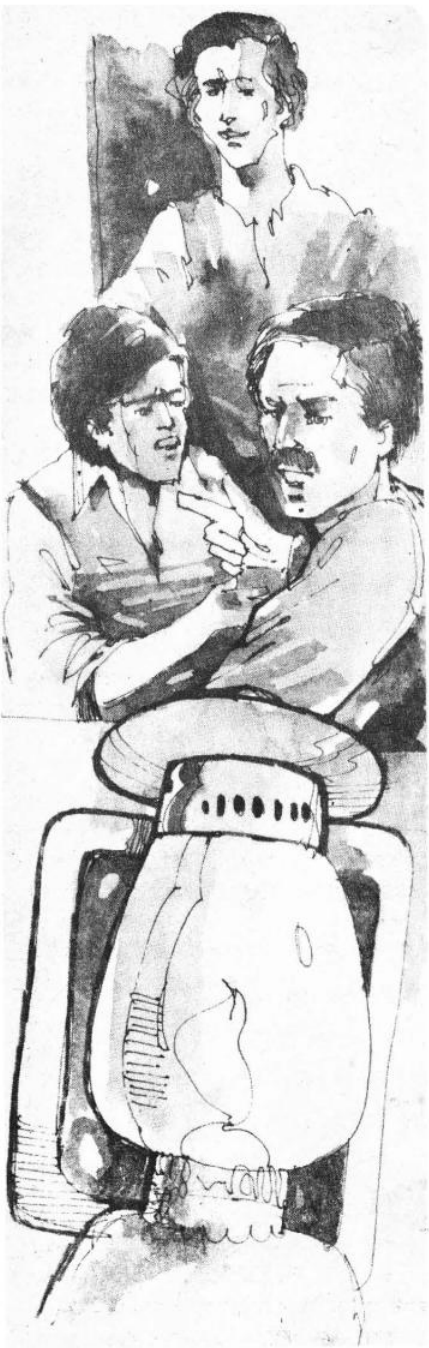

বুকস-এর। দোকান আর ব্যবসা দুইই ভাল জমে ওঠে। এ-সব জানো তুমি?"

মাথা হেলাল শিশির। "আমি গল্প শুনেছি।"

"নিশিকান্তবাবু ব্যবসায় ফেঁপে উঠছিলেন দেখে তাঁর সেই মামাতো দাদার ধারণা হল, তোমার ঠাকুরদা বিস্তর টাকা-পয়সা সরিয়ে আগের ব্যবসা ফেল পড়িয়েছেন। এই নিয়ে দুই পক্ষে ঝগড়া, অশান্তি। এমন কী, মামলা-মোকদ্দমা। ...শেষ পর্যন্ত একদিন তোমার ঠাকুরদাকে ভাড়াটে লোক দিয়ে মেরে ফেলা হল। তখন যুদ্ধের সময়, কলকাতায় ব্ল্যাক আউট চলছে, একটা গাড়ি এসে নিশিকান্তবাবুকে চাপা দিয়ে পালিয়ে যায়। তিনি দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফিরছিলেন। ...তোমার তখন জন্ম হয়নি।"

শিশির একেবারে পাথর। সিংহিবাবু এত কথা জানেন! অন্তত চল্লিশ বছর আগের ঘটনা এ-সব শিশির নিজেই ভাল করে জানে না। আবছা-আবছা শুনেছে। বলল, "আপনাকে এ-সব কথা কে বলেছে? জানলেন কেমন করে?"

শিশিরের কথায় কান না দিয়ে সিংহিবাবু বললেন, "তোমার বাবা তখন নতুন উকিল। তিনি জানতে পারেন। থানা, পুলিশ, মামলা মোকদ্দমা শুরু হয়ে যায়। চ্যাটার্জিসাহেব নামে এক বিখ্যাত ল'ইয়ারকে নিয়ে তিনি মামলা লড়তে থাকেন। তাঁর মামাতো জেঠাটিকে এমন করে জড়িয়ে ফেলেছিলেন মামলায় যে, জেঠার সবই যেতে বসেছিল। তা ফাঁসিকাঠে ঝুলতে-ঝুলতে তিনি বাঁচলেন। প্রাণে বাঁচলেন, কিন্তু মামলা চালাবার খরচ জোগাতে গিয়ে ভদ্রলোক ভিখিরি। মারাও গেলেন। ভবতোষ হল তাঁর ছেলে। সম্পর্কে তোমার বাবার জেঠতুতো ভাই, তোমার কাকা।"

শিশিরের নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবার অবস্থা। ভবতোষবাবু তার কাকা। কী আশ্চর্য! বাবুর দিকে তাকাল। বাবু একেবারে বোকার মতন বসে। এ-সব কিছুই তার জানা ছিল না।

সিংহিবাবু বললেন, "তোমার ঠাকুরদার সেই দোকান অন্য লোক কিনে নিয়েছিল। ভবতোষ আগে দুঃখকষ্টে মানুষ হয়নি। তবে তার বাবা মারা যাবার আগে থেকেই টাকাপয়সার টানাটানি বুঝতে পারছিল। বাবা মারা যাবার পর ভিখিরি। তবে মানুষটি ধুরন্ধর। পারে না

এমন কাজ নেই। নানা রকম বেআইনি লোক-ঠকানো ব্যবসা, চুরি-জোচ্চুরি করে সে আজ বড়লোক। তার অর্থের অভাব নেই। কিন্তু একটা জিনিস সে ভুলতে পারছে না। তার বিশ্বাস, তোমার বাবার জন্যেই তার বাবার শেষ জীবন দুঃখকষ্টের মধ্যে কেটেছে, মারা গিয়েছে তার বাবা।"

সিংহিবাবুর কাজের লোকটি চা নিয়ে এল।

"নাও, একটু চা খাও," সিংহিবাবু বললেন।

শিশির আর বাবু চা নিল। সিংহিবাবুও হাত বাড়িয়ে চা নিলেন।

কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ। বাতাসে খানিক ঠাণ্ডা ভাব। শরৎকালের সন্ধে বলে বেশ বোঝা যায়। আকাশ তারায়-তারায় ভরা।

শিশির বলল, "এত পুরনো ব্যাপারের সঙ্গে আমার কিসের সম্পর্ক?"

সিংহিবাবু কাসলেন, তারপর গলা পরিষ্কার করে বললেন, "ভবতোষ নানাভাবে তোমার বাবাকে জব্দ করার চেষ্টা করেছে। পারেনি। সোজা কথা, সে তোমার বাবার ওপর হাড়ে-হাড়ে চটা। তার যে কী আক্রোশ তোমার বাবার ওপর, তুমি জানো না। প্রতিশোধ নিতে চায়। পারে না। তার ওপর এমনই কপাল তার, ভবতোষের বিরুদ্ধে এক জাল-জোচ্চুরির মামলা এনেছেন পি. রায় বলে এক ভদ্রলোক। ব্যবসা সংক্রান্ত মামলা। ভবতোষ বিপদে পড়ে রয়েছে। সে তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করেছে। কলকাতার বাড়িতেই। একটা মিটমাট করিয়ে দিতে বলেছিল। তোমার বাবা রাজি হননি।...হ্যাঁ, আর-একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি, ভবতোষ তোমার বাবাকে কিসের কিছু কাগজপত্র দেখিয়ে হাজার ত্রিশ-চল্লিশ টাকা চেয়েছে। কী কাগজ তা আমি জানি না। তোমার বাবা টাকা দিতে চাননি।"

বাবু চুপচাপ ছিল। এবার কথা বলল। "এত রকম গোলমালের মধ্যে শিশির কেমন করে আসে?"

"আসত না। ঘটনাচক্রে হঠাৎ এসে গেছে।...ভবতোষের ধারণা, শিশিরের বাবাকে যখন কোনো মতেই জব্দ করা যাচ্ছে না, তখন শিশিরকে এমন একটা অবস্থায় এনে ফেলা, যে-অবস্থা ওর বাবা সহ্য করতে পারবেন না। নরম হতে বাধ্য হবেন। বিশেষ করে পি. রায় কোম্পানির মামলায় যদি ওরা জিতে যায়, ভবতোষকে হয় গলায় দড়ি দিতে হবে, নাহয় জেলে বসে ঘানি ঘোরাতে হবে।"

"আপনি বলতে চাইছেন, শিশিরকে কব্জা করে ভবতোষ ব্ল্যাকমেইল করতে চায়?"

"হ্যাঁ, সেই রকম।"

শিশির বলল, "আমি একটা কথা ভাবছি। বাবা কি জানে না, ভবতোষ এখানে আছে? আমায় তো কিছু বলেনি কোনোদিন?"

সিংহিবাবু আবার যেন হাসলেন একটু। বললেন, "ভবতোষের আসল নাম তোমার বাবা জানেন, নকলটা নয়। ভবতোষের আসল নাম শ্যামসুন্দর। ভব ওর ডাক-নাম। সেই থেকে ভবতোষ।"

শিশির বলল, "বাবাকে আমি লিখব।"

সিংহিবাবু বললেন, "এখন নয়। পরে লিখো। আমি বলব কখন লিখতে হবে।...তা এটা তো যা শুনলে, অর্ধেক, বাকিটা শুনবে না?"

"বলুন।" **(ক্রমশ)**

ছবি : সুনীল শীল

সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেনাপতি, সমস্ত ইউরোপ ভূখণ্ডের সম্রাট, কোথায় আরাম-কেদারায় চোখ বুজে বসে থাকবেন আর নরসুন্দর আস্তে-আস্তে তাঁর দাড়ি কামিয়ে দেবে, তা না, নিজের হাতে কাজটি রোজ করা চাই। বলতেন, "অন্যের হাতে ধারালো অস্ত্র দিয়ে তার সামনে গাল-গলা এগিয়ে দেব, সে-শর্মা আমি নই।" তবে নিজের হাতে কামালেও ব্যাপারটাতে যথেষ্ট বিলাস ছিল। একজন সামনে আয়না ধরবে, আর-একজন সাবান-জল। তারপর হাতে ক্ষুর নিয়ে নানা কসরত করে দাড়ি কামানো। কিন্তু এত ছটফটে ছিলেন সম্রাট যে রোজই গাল কেটে যেত ক্ষুরে। সম্রাটের নাম নেপোলিয়ান বোনাপার্ট।

"বালী বালী, শক্ত
দানার টুথ পাউডার
আপনার দাঁত ও মাড়ির
ক্ষতি করতে পারে…"

কোলগেট টুথ পাউডার দিয়ে আপনার দাঁত ও মাড়ি রক্ষা করুন – সেইসঙ্গে মুখের দুর্গন্ধও বন্ধ করুন!

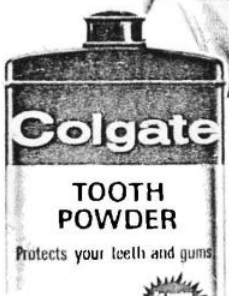

কোলগেট টুথ পাউডার একেবারে মিহি আর সাদা। তাই আস্তে আস্তে মাড়ি ঘষার সময় এর ঝকঝকে করার মৃদু উপাদান দাঁতের ওপরকার ময়লা তুলে ফেলে আপনার দাঁতকে করে তোলে পরিষ্কার ধবধবে সাদা। কোলগেটের ঘন ফেনা আপনার দাঁতের ফাঁকে-ফোকরে ঢুকে দুর্গন্ধ ও ক্ষয়কারী রোগজীবাণু-গুলোকে নষ্ট করে ও মুখের দুর্গন্ধ দূর করে।

আপনার পরিবারের সকলে এই আধুনিক উপায়ে দাঁত ও মাড়ি সুরক্ষার জন্যে নিয়মিত কোলগেট টুথ পাউডার ব্যবহার করুন। পিপারমেণ্টের মত এর ঠাণ্ডা আমেজভরা স্বাদ ওদের খুবই ভাল লাগবে।

TP.G.30 BN

বিধাননগর রাষ্ট্রীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কী বলেন

রঞ্জিতকুমার ঘোষ

১৯৭৭-এর ৭ মার্চ সল্টলেকের গভর্নমেণ্ট সেকেণ্ডারি স্কুলের প্রতিষ্ঠা। পরে নাম পালটে বিধাননগর গভর্নমেণ্ট হাই স্কুল রাখা হয়। কনিষ্ঠ এই গভর্নমেণ্ট স্কুলটি থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে মাত্র দুটি ব্যাচ, কিন্তু ওই দুবারই যা ফল হয়েছে তাতে সকলে চমৎকৃত হয়েছেন। প্রথমবারের ২৪ জনের মধ্যে ফার্স্ট ও সেকেণ্ড ডিভিশন সমান-সমান। একটি ছেলের স্থান ছিল প্রথম কুড়ির মধ্যে। দ্বিতীয় বার অর্থাৎ এবারে ২৫টি ফার্স্ট ডিভিশন ১৩টি সেকেণ্ড ডিভিশন এবং দু'টি মেয়ে কম্পার্টমেণ্টাল। স্কুলটি সহ-শিক্ষামূলক। এখন এক নম্বর সেক্টরের বি-ডি ব্লকের এই স্কুলটিতে (দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত) ছাত্রছাত্রী-সংখ্যা প্রায় সাড়ে-আটশোর মতো।

প্রধান-শিক্ষক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায়। এর আগে ছিলেন কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে। শিক্ষকতা করছেন তিন দশকেরও বেশি, এর মধ্যে প্রায় সবটাই সরকারি স্কুলে। প্রধান শিক্ষকের পদে আছেন ১৯৬৯ থেকে। সত্যেনবাবুর বিষয় ইংরেজি। শুনেই জিজ্ঞেস করলাম: ইংরেজি এখন এত সহজ করে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এত ছেলেমেয়ে ওই বিষয়ে ফেল করছে কেন? উনি বললেন, "প্রথমত, তারা ভাল করে বই পড়ে না। বই থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে প্রশ্ন করা হলে তা বুঝতে পারে না ওই জন্যেই। তারপর, দেখবেন, এই সব ছেলেমেয়ে বাক্যের গঠন বা সেণ্টেন্স-স্ট্রাকচারই শেখেনি। কারেক্ট সেণ্টেন্স না হলে কোথা থেকে নম্বর পাবে? এছাড়া আছে বানান ভুলের ব্যাপার। তবে একটা কথা, এখন সিলেবাস ও পরীক্ষা-রীতি এমনই হয়েছে যে ইংরেজি না জেনেও পাশ করা শক্ত নয়—যদি পরীক্ষার্থী টেক্সটের এবং বাইরের গ্রামার অংশ ভালভাবে তৈরি করে। কিন্তু এরা সেটাও করছে না।"

ভাল ছাত্ররা কীভাবে ইংরেজি পড়বে? আমার প্রশ্নের উত্তরে সত্যেনবাবু বললেন, সব সময়ই নতুন শব্দ, শব্দের নতুন ব্যবহার ও রচনারীতি বা স্টাইলের উৎকর্ষের দিকে তাদের নজর থাকবে। সুতরাং তারা ইংরেজি টেক্সট বইয়ের সিলেবাসবহির্ভূত অংশগুলো এবং নামী লেখকদের—যেমন শেক্সপীয়ার কিংবা ডিকেন্স—লেখাগুলির সংক্ষেপিত সংস্করণও

ফোটো: সত্যেন্দ্রনাথ সেন

পড়বে। আর ভাল, মাঝারি, সাধারণ—সবরকম ছাত্রছাত্রীই প্রশ্নোত্তর লেখা অভ্যাস করবে, বিশেষত টেস্ট পেপার্স থেকে, এবং উপযুক্ত ব্যক্তিকে দিয়ে উত্তর সংশোধন করিয়ে নেবে।

কী রকম উত্তরকে ভাল বলা যায় (শুধু ইংরেজি নয়, যে-কোনও বিষয়েই)? আবার প্রশ্ন করি। বললেন, "এখন প্রশ্নের ধরন অবজেকটিভ হওয়ায় রচনাধর্মী ('এসে টাইপ') উত্তর লেখার সুযোগ খুব অল্প। তবুও লেখার মধ্যে প্রকাশভঙ্গির উৎকর্ষ দেখানো

শিবরাম চক্রবর্তীর
গল্প মানেই
চিরকালীন হাসির উৎস

শিবরাম চক্রবর্তী তাঁর সৃষ্ট চরিত্র হর্ষবর্ধনের মতোই, নিত্য নতুন। বাংলা সাহিত্যের হাসির গল্পের ক্ষেত্রে তিনি এক যুগ, এক চিরকালীন-চিরনবীন প্রতিষ্ঠান। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, তিনি নেই। শেষ দিকে তিনি কমই লিখেছেন। তবু সৌভাগ্য বলব যে, কিছু-কিছু স্মরণীয় গল্প অসুস্থতার মধ্যেও লিখে গেছেন। সেই রকম কিছু গল্প নিয়েই তাঁর নতুন বই 'লাভের বেলায় ঘণ্টা'। হর্ষবর্ধন ও গোবর্ধনকে নিয়ে লেখা গল্প যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে নানান মজাদার পরিস্থিতির তীব্র কৌতুককর কাহিনী। প্রতিটি গল্প হাসি-জাগানো, প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র অনাবিল হাসির অনিঃশেষ উৎস।

আরো অনেক বই

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ভয়ঙ্কর সুন্দর ৭·০০ সত্যি রাজপুত্র ৮·০০ তিন নম্বর চোখ ৬·০০ হলদে বাড়ির রহস্য ও দিনে ডাকাতি ৮·০০ সবুজ দ্বীপের রাজা ৮·০০ জঙ্গলের মধ্যে গম্বুজ ৮·০০ ডংগা ৭·০০ পাহাড়চূড়ায় আতঙ্ক ১০·০০ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ঘনাদার কাবলু কাকা ৮·০০ অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ এবং ৭·০০ তপনচরিত ৬·০০ সমগ্র কিশোর সাহিত্য প্রথম ২৫·০০ দ্বিতীয় ২৫·০০ পূর্ণেন্দু পত্রীর কী করে কলকাতা হলো ৫·০০ ছড়ায় মোড়া কলকাতা ৫·০০ কলকাতার রাজকাহিনী ৫·০০ হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের ভয়ের মুখোশ ৬·০০ সীমানা ছাড়িয়ে ৬·০০ পাঁচ মুণ্ডির আসর ৭·০০ কবন্ধ বিগ্রহের কাহিনী ১০·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯ ফোন ৩৪ ৪৩৬২

যেতে পারে। আর চাই শোভন হস্তাক্ষর। আর একটা খুব দরকারি কথা, উত্তরের প্রতিটি অংশের জন্যে আলাদা প্যারাগ্রাফ দিতে হবে এবং তারা যে আলাদা সেটা বোঝাবার জন্যে দু'টি প্যারার মধ্যে উপযুক্ত ব্যবধান রাখতে হবে। খাতায় মানে উত্তরপত্রে মার্জিন দেওয়া দরকার—হাতে ভাঁজ করে নয়, রুলারের সাহায্যে টেনে।

"আসল কথাটা হল, নিয়মিত প্রশ্নের উত্তর লেখা অভ্যাস করলে উত্তরের মান ক্রমশই ভাল হয়ে যায়। বিশেষত অঙ্কে নিয়মিত অভ্যাস চাই-ই। ভাল নম্বর পেতে হলে জ্যামিতির রাইডার করতে পারা চাই। ভূগোল, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, জীবন-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে সব সময় ছবি এঁকে পড়া তৈরি করতে হয়। উত্তর-পত্রে সুযোগ পেলেই ডায়াগ্রাম দিতে হবে—না চাইলেও। ইতিহাসে টাইম চার্ট ও ম্যাপের সাহায্যে পড়া উচিত।"

ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট বয়

জয়দীপ কুণ্ডু তার দাদার উপযুক্ত ভাই হতে পারবে কি না জিজ্ঞেস করাতে সে উত্তরটা এইভাবে দিল—"ইচ্ছে তো অনেক কিছুই আছে, শেষ পর্যন্ত কী হবে জানি না।" ওর দাদা সুদীপ ১৯৭৫-এর হায়ার-সেকেণ্ডারিতে হিউম্যানিটিজ বিভাগে সপ্তম স্থান পেয়েছিল কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মিশন থেকে। বাবা শ্রী গিরিজাচরণ কুণ্ডু সেচ বিভাগের উচ্চপদস্থ অফিসার। 'শ্রাবণী আবাসনে' থাকে জয়দীপরা।

নাইনের অ্যানুয়ালে শতকরা ৮৩ নম্বর পেয়ে জয়দীপ ফার্স্ট হয়েছিল। ওর নিকট প্রতিদ্বন্দ্বীরা হল উদয়ন রায়, সুকল্প বিশ্বাস, সৌগত দত্ত। জয়দীপের পড়াশোনায় সাহায্য করেন স্কুলের শিক্ষকরা আর দুই গৃহশিক্ষক। স্কুল থাকলে দিনে ছ'সাত ঘণ্টার মতো ও লেখাপড়ায় দেয়। ছুটির সময় সেটা বেড়ে দশ-বারো হয়। জয়দীপ টেক্সট বইগুলো খুব ভালভাবে পড়ে। তারপর বাইরের বই থেকে যত বেশি অতিরিক্ত পয়েন্ট পাওয়া যায়, তা সংগ্রহ করে। তারপর এক একটি বিষয়ে যত রকম প্রশ্ন হওয়া সম্ভব টেস্ট পেপার্স থেকে তা ঠিক করে নিয়ে সেগুলির উত্তর লিখে সংশোধন করায়। বাইরের যে-সব বই ও পড়ে তার মধ্যে আছে বিভূতি চৌধুরীর রচনা-বিচিত্রা, ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য - পল্লব সেনগুপ্ত এবং ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্যের রচনা বইদু'খানিও; পি কে দে সরকারের পুরনো বইটি, এ. সি. সেন, কে ব্যানার্জির প্রোব্যাবল এসেজ; অঙ্কে এ মাইতি, কৃষ্ণপদ গাঙ্গুলি, মৃদুল সেন, ভূগোলে ঘোষ - বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেশ রায়চৌধুরী, ডঃ শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়; ইতিহাসে প্রভাতাংশু মাইতি, ডঃ রমেশ মজুমদার ও কালীকিঙ্কর দত্ত, কে. কে. ভরদ্বাজ; ভৌতবিজ্ঞানে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের বই, অলক চক্রবর্তী, অজয় চক্রবর্তী; জীবনবিজ্ঞানে কুণ্ডু-দাশ-কুণ্ডু, ডঃ অমূল্যভূষণ চক্রবর্তীর উচ্চ-মাধ্যমিকের বইটি, সান্যাল-চট্টোপাধ্যায় ও সিংহ-অধিকারী ইত্যাদি। অতিরিক্ত বিষয় অঙ্কের জন্যে ও কেশব নাগ এবং মাইতি-মাইতি ব্যবহার করে।

জয়দীপের প্রিয় বিষয় বাংলা। সাহিত্যচর্চাও করে অল্পবিস্তর। তবে তার সঙ্গে ওর প্রিয় খেলা ক্রিকেটের কোনও বিরোধ নেই। গান শুনতে ও গল্পের বই পড়তে ভাল লাগে। আনন্দমেলার লেখাপড়া বিভাগ ছাড়া টিনটিন ও টারজান ওকে আকৃষ্ট করে। কী হতে চায়, জিজ্ঞেস করাতে শ্যামলবরন কিশোরটি উত্তর দিল—মেরিন ইঞ্জিনীয়ার। চশমার মধ্যে দিয়ে বুদ্ধিদীপ্ত চোখদুটি আর একবার চকচক করে উঠল।

(আগামী সংখ্যায় শুরু হবে নতুন অ্যাডভেঞ্চার)

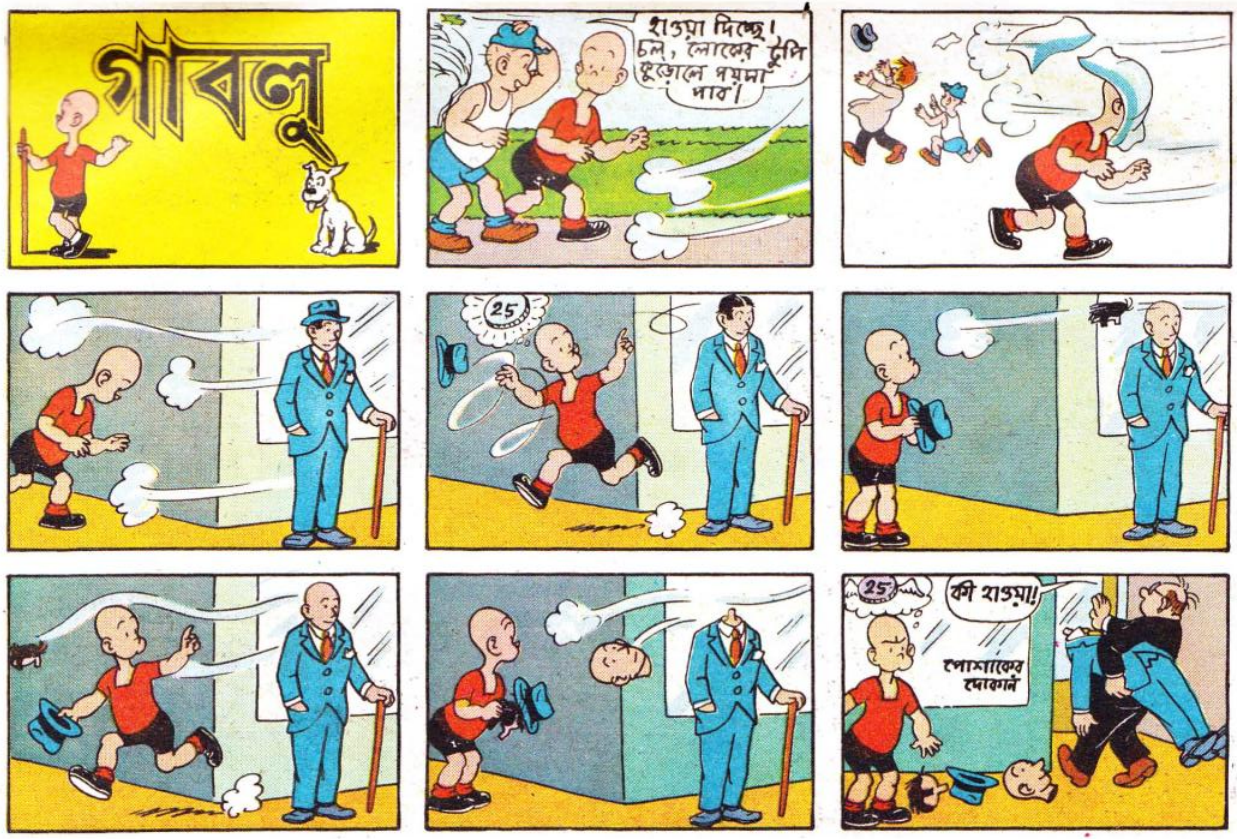

গাবলু
হাওয়া দিচ্ছে। চল, লোকের টুপি কুড়োলে পয়সা পাব।
25
25
কী হাওয়া!
পোশাকের দোকান

স্বরধ্বনির টানাহ্যাঁচড়া

বাচস্পতি

হিগিনকাকু বললেন, "এখানেও রবীন্দ্রনাথ মানে কী? তুই কি জানিস রবীন্দ্রনাথই প্রথম বাংলাভাষার নানা নিয়মকানুন খুঁজে বার করেন? সত্যিকারের ভাষাবিজ্ঞানীও বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথই প্রথম।"

ভণ্টুর বাবা বললেন, "যাকগে, তুই যে বললি, একটা শব্দের মধ্যে আগে যদি 'অ' থাকে, পরে থাকে 'ই' বা 'উ'—তাহলে 'অ'টা 'ও' হয়ে যাবে—এর মানে কী?"

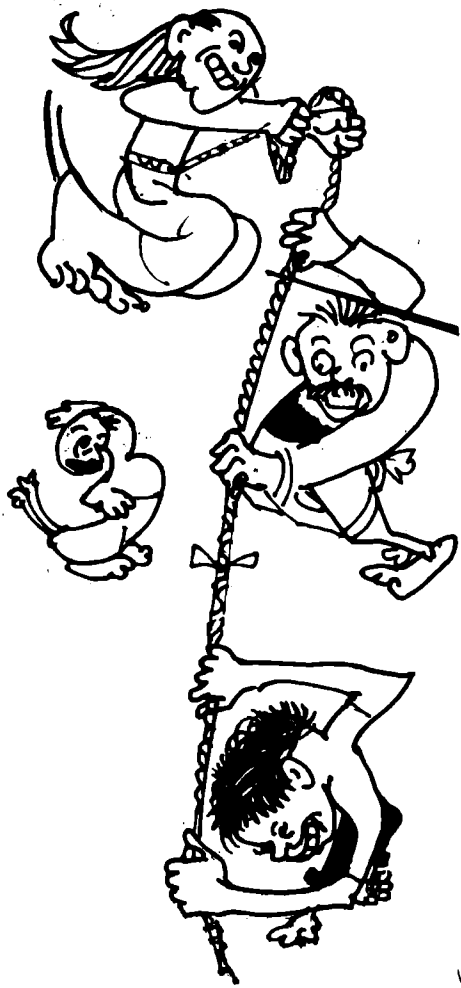

"এর মানে হল—" বলে হিগিনকাকু একটু থামলেন। থেমে বললেন, "সিলেব্‌লের ব্যাপারটাই তো তোমাদের বলা হয়নি। সিলেব্‌ল কী জানো?"

বাবা বললেন, "ছেলেবেলার ব্যাকরণ আমি সব ভুলে গেছি, এখন তুই মাস্টারি করতে এলি!"

ভণ্টু বলল, "কাকু, তুমি বলো-না, সিলেব্‌ল কী?"

হিগিনকাকু বললেন, "সোজা সরল কথায়, উচ্চারণের সবচেয়ে কম চেষ্টায় কথার যে-টুকরো আমরা এক-একবার উচ্চারণ করতে পারি—তাই হল সিলেব্‌ল। যেমন 'উচ্চারণ' কথাটায় আছে তিনটে সিলেব্‌ল—উচ্-চা-রণ। 'ভাষাবিজ্ঞান' কথাটার মধ্যে চারটে—ভা-ষা-বিগ্-জ্ঞান। বুঝেছ?"

ওরা দুজনেই মাথা নাড়ল।

হিগিন বলতে লাগলেন, "এখন একটা শব্দে প্রথম সিলেব্‌লে যদি 'অ' ধ্বনিটা থাকে, আর তার ঠিক পরের সিলেব্‌লে যদি ই বা উ, অর্থাৎ [+ঊর্ধ্ব] স্বরধ্বনি থাকে, তাহলে 'অ'-টা 'ও' হয়ে যাবে। এই দৃষ্টান্তগুলো লক্ষ করো

ঘট	ঘটি (ঘোটি)
চট	চটি (চোটি)
নট	নটী (নোটি)
বল্	বলুন (বোলুন)
শহর	শহুরে (শোহুরে)
রঞ্জন	রঞ্জু (রোঞ্জু)
ঝগড়া	ঝগড়ুটে (ঝোগ্‌ড়ুটে)
জঙ্গল	জঙ্গুলে (জোঙ্গুলে)
বল	বলীয়ান (বোলিয়ান)
বকা	বকুনি (বোকুনি)

বাবা বললেন, "এ তো জানিই। মানে সব সময় খেয়াল করি না হয়তো, কিন্তু 'জোঙ্গুলে' না বলে কেউ 'জঙ্গ্-উলে' বলে নাকি?"

হিগিনকাকু বললেন, "ঠিক আছে, স্মার্ট গাই! কিন্তু কেন এটা হচ্ছে আমায় বলতে পারো? 'ই-উ' পরে থাকলেই কেন 'অ' 'ও' হচ্ছে?"

বাবা বললেন, "কেন?"

হিগিনকাকু গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, "স্বরধ্বনিগুলোর দড়ি-টানাটানির অর্থাৎ টাগ-অব-ওয়ারের জন্যে।" (ক্রমশ)

তবু টি· ভি· এল

প্রসাদ

শেষ পর্যন্ত চামেলিদের বাড়িতেও টেলিভিশন এল। কতদিন থেকে মিলি আর চম্বল বাবাকে বলে আসছে টি· ভি· কিনবার জন্যে। তাদের বন্ধুদের সকলের বাড়িতে নাকি কবে এসে গেছে। তারা বাড়িতে বসে-বসে কত মজা করে সিনেমা দেখছে, খেলা দেখছে। তাই বলে কি তারা পড়াশোনা করছে না? পরীক্ষায় সব ফেল করছে? এ-রকম হাজার যুক্তিতেও বাবাকে কিছুতেই আর টলানো যায় না। গত কয়েক মাস ধরে এই ধরনের কথোপকথন বাড়িতে প্রায়ই শোনা যেতে লাগল:

Chameli: When are you going to buy a T. V., Daddy?

Father: I don't know that I ever am.

Chameli: Oh, Daddy please!

Father: It's no use saying, "Oh, daddy, please!" I've told you a thousand times if I've told you once that I've no intention of ruining the few hours of peace and quiet that I look forward to enjoying in the house when I come back from work. And what about your studies? Aren't you neglecting them enough already? A T.V. will be another cause of your neglecting them more.

In other circumstances Chambal would have remarked that Milly couldn't possibly neglect her studies more than she was doing. He's often found talking like that when his sister is being discussed. Now, however, he was on Milly's side.

Chambal: All my friends have T.V.'s in their houses. But they're not bad at their studies. And I remember reading somewhere the other day that the T.V. is a great help in education.

Father: Well, children, I hate disappointing you, but I'm still not convinced that we need a T.V. in this home. Do you know that in the West they have started thinking about the bad effects of the T.V. on children? That settles it for me. And now, do you mind getting back to your work?

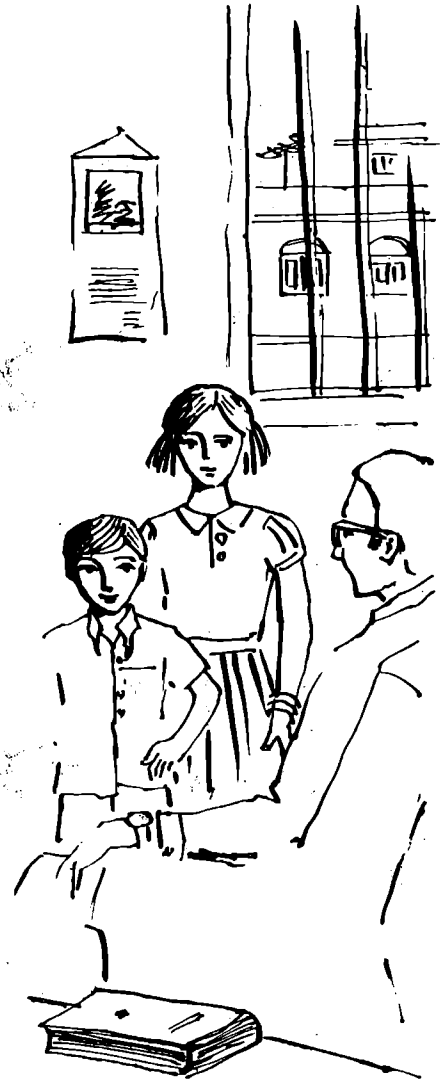

কিন্তু তবু শেষ পর্যন্ত টেলিভিশন এল। বাবা আগে কাউকে কিচ্ছু বলেননি। হঠাৎ একদিন নিয়ে এসে হাজির।

"But that will be the end of our cosy evenings at home, I can't help thinking." he said.

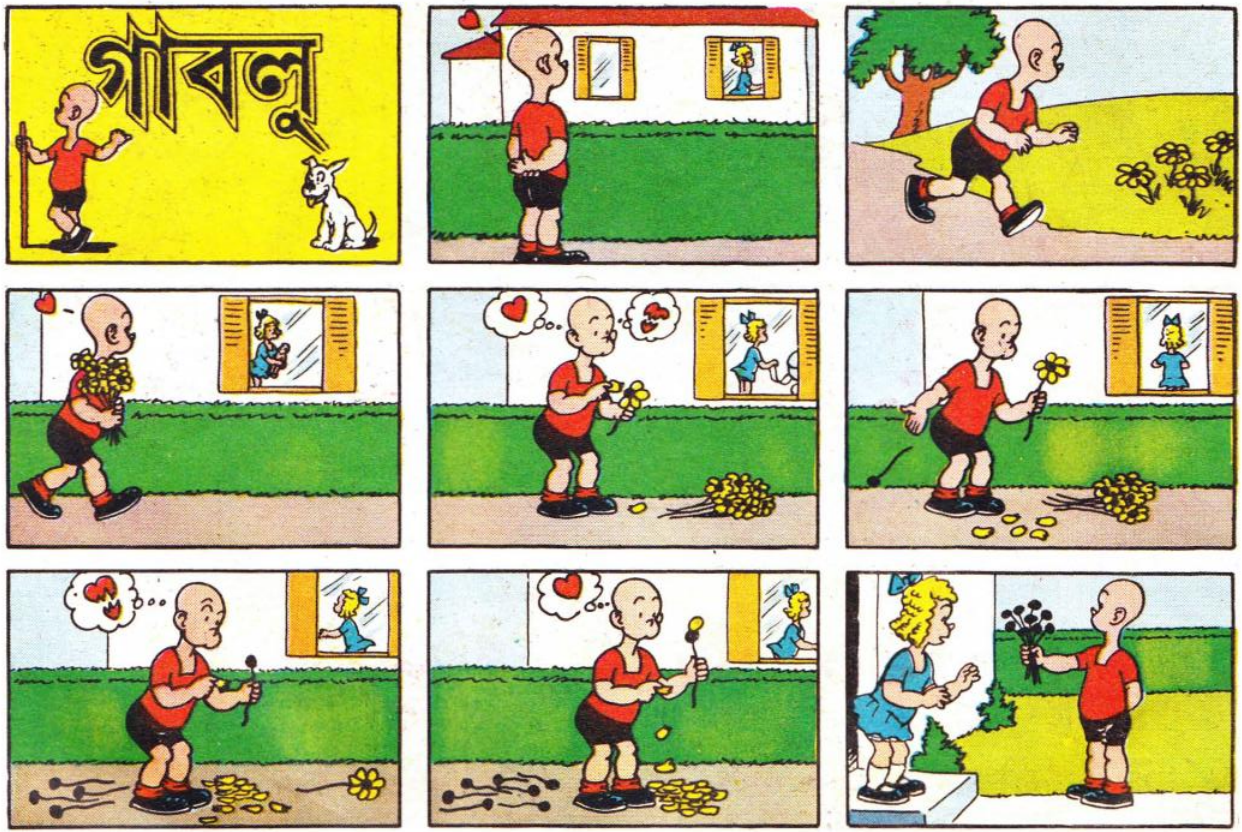
গাবলু

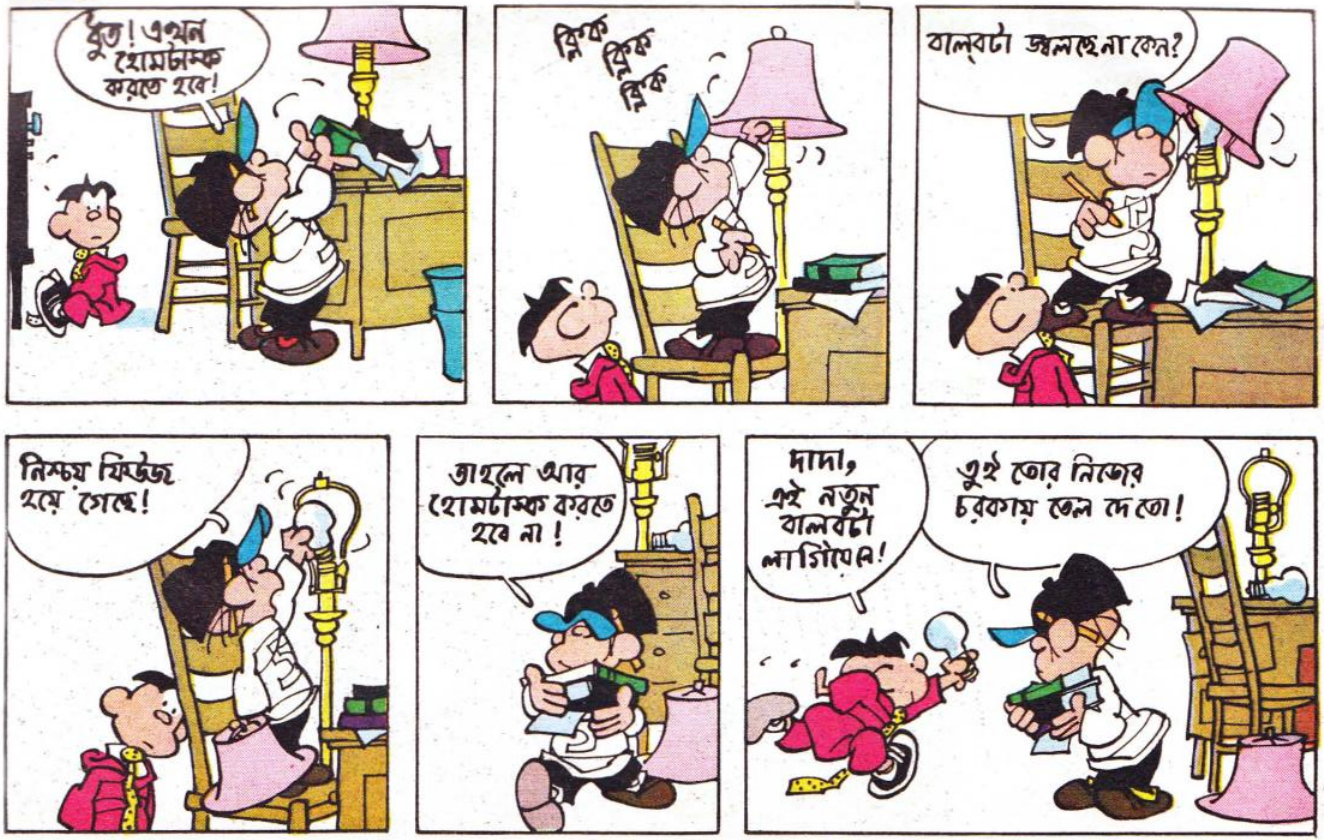
ধুত! এখন হোমটাস্ক করতে হবে!
ক্লিক ক্লিক ক্লিক
বাল্‌বটা জ্বলছে না কেন?
নিশ্চয় ফিউজ হয়ে গেছে!
তাহলে আর হোমটাস্ক করতে হবে না!
দাদা, এই নতুন বাল্‌বটা লাগিয়ে দে!
তুই তোর নিজের চরকায় তেল দে তো!

ডিম থেকে চারটে পাখি

ডিমকে চার ভাগে ভাগ করে নাও (১নং নমুনা)। এবার দু'নম্বর নমুনায় লক্ষ করে দ্যাখো চারটে পাখি আঁকার জন্যে কী ভাবে ভাগ করে নেওয়া হল। শেষের নমুনায় দ্যাখো চারটে পাখি কেমন উড়ন্ত রূপ পেল। একটু বড় করে চেষ্টা করলে দেখতে আরও মজার হবে। ইচ্ছেমতো রঙে ভরে ফেলতে পারো পাখিদের।

—রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

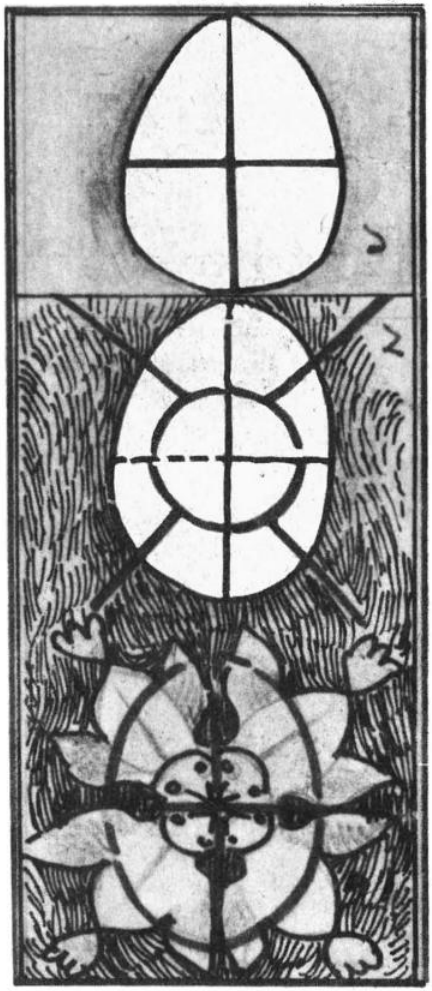

কার্ডবোর্ডের কাজ : চিঠি রাখার বাক্স

তোমার দরকার ও মাপমতো বোর্ড নিয়ে ওপরের দিকে (নমুনায় লক্ষ করো) খানিকটা বাদ দিয়ে চারপাশে দুই থেকে তিন ইঞ্চি করে দাগ দিয়ে নাও। এবার ভেতরে চিঠির বাক্স যতটা মোটা করতে চাও সেইমতো জায়গা রেখে ফোঁটা-ফোঁটা দাগ দিয়ে রাখো যাতে ভাঁজ করতে সুবিধে হয়। এবার এখানে দেখানো নকশার কালো অংশটুকু বাদ দিলেই বাক্সের ফর্মা পাবে। ২নং চৌকোর দু'পাশেই চিরে নিয়ে মুড়ে একে অপরের সঙ্গে ভাঁজ করে আঠা দিয়ে জুড়ে দিলেই চিঠির বাক্স হাতে।

জেনে রাখো—(১) এই কাজে বাক্সের ভেতরের চওড়া মাপ আর পাশের ভাঁজ করার জন্য কাগজের মাপ ঠিক না-রাখলে কিছুতেই দু'কোণ মিলবে না। (২) টাঙাবার জন্য দরকারমতো ফুটো করে নাও।

—কারিগর

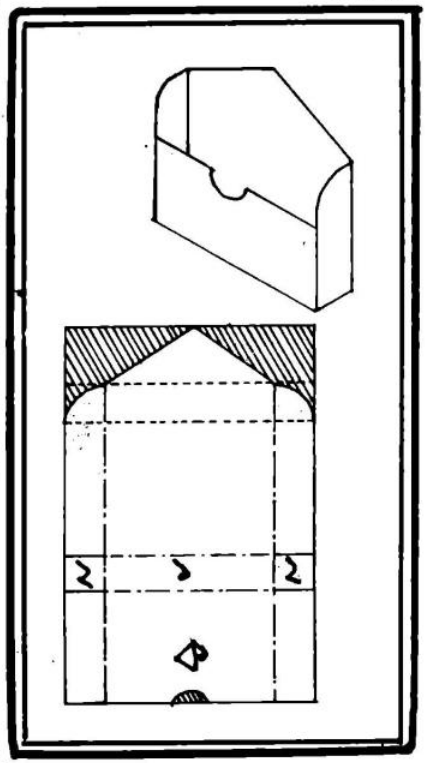

রেক্সোনা আপনার ত্বকের যত্ন নেয়...

ত্বক রাখে কোমল ও উজ্জ্বল!

রেক্সোনায় আছে চারটি প্রাকৃতিক তেলের মিশ্রণ—
কেড, ক্যাসিয়া (দারুচিনি বিশেষ), লবঙ্গ আর টেরিবিন্থ। রেক্সোনা মেখে স্নান করুন— এ আপনার ত্বক রাখে কোমল ও উজ্জ্বল। অঙ্গে অঙ্গে জড়িয়ে রাখে আপনার প্রিয় সুরভি...আপনার ত্বকের যত্ন নেবার স্বাভাবিক উপায়!

রেক্সোনা আপনার ত্বকের পক্ষে ভালো

হিন্দুস্থান লিভার-এর একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিনটাস-RX.78-1812 BG

জীবন বীমা আপনার ভবিষ্যতের সুরক্ষার সবচেয়ে নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ উপায়। এ সম্পর্কে বিশদ জেনে নিন।

যোগক্ষেমং বহাম্যহম্
ভারতীয় জীবন বীমা নিগম